নাগপাশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগপাশ প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

কত কথাই মনে হয় !

কথাই কী মনে হয় ? মন কী কথা দিয়ে ভাবে ? ভাব থেকে ভাবনা পর্যন্ত সবই কী রূপ নেয় কথায় ?

কালিদাসের সেই অপরূপ উপমাটিই আজ বারবার নরেনের মনে পড়ে। পার্বতী ও পরমেশ্বরের একতাকে বাক্য ও অর্থের চিরন্তনী অবিচ্ছিন্নতা হিসাবে কল্পনা করা।

মানে ছাড়া কথা নেই। কথা ছাড়া মানে নেই।

কিন্তু মন ?

মনেরও কী কথা ছাড়া গতি নেই ? এটাই মনের শেষ মানে দাঁড়ায় ?

হঠাৎ যেন সচেতন হয়েই নরেন নিজের মনে একটু হাসে।

মনোবিজ্ঞানের এত মোটা এমন বিখ্যাত একটি বই শেষ কবে আনমনে নানাকথা ভাবতে ভাবতে চিন্তাটা শেষে এইখানে এসে ঠেকল !

লক্ষ্যভেদ করে অর্জুনের লাভ হয়েছিল দ্রৌপদী। মনের রহস্য ভেদ করে তার কী লাভ হল ?

মানসিক একটু সুখ ?

সকালবেলা ধরণীর বাড়ির রোয়াকটুকুতে দাবার ছক পেতে বুদ্ধির যুদ্ধে নেমে, ধরণী আর অবিনাশ কিস্তিমাতের যে সুখ আশা করছে ?

কয়েকজন একমনে তাদের লড়াই দেখে সুখের যে অংশ ভাগ পাচ্ছে ?

তাছাড়া কোনো মানে হয় না তার বইপড়ার জ্ঞানচর্চা করার। সত্যই তো, আর কিছু করার নেই সামান্য চাকরিটা করা ছাড়া, তাস পাশা দাবা কিংবা নিছক হাসি গল্পের আড্ডা তার ভালো লাগে না, বই পড়ে তবু উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন জীবনটার কথা ভুলে থাকতে পারে, সময় কাটে।

লোকে ভাববে, জ্ঞানলাভের জন্য কী আগ্রহ তার, কী সাধনা ! জ্ঞানের সাধক বিখ্যাত জ্ঞানীর প্রাণের ছোঁয়াচটা তার প্রাণেও লেগেছে।

রাত জেগে বইটা পড়েছিল। বেশি রাত পর্যন্ত না হলেও আলো নিভিয়ে শুতে এগারোটা বেজে গিয়েছিল বইকী। পরীক্ষা পাসের পড়া যারা করে, পাড়ায় তারাও তখন রাত্রির সাধনা সাঙ্গ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঝুম হয়ে গিয়েছে চারিদিক।

দিনে যে শব্দ ওঠে না, উঠলেও কানে পৌঁছায় না, মাঝে মাঝে সেই সব শব্দেই শুধু সাড়া দিয়েছে, জীবন্ত মানুষ ও প্রাণীর পৃথিবী—এই পাড়াটুকু।

ভোর চারটেয় উঠে আবার বইটা পড়তে শুরু করেছিল। তবে ঘুমন্ত পৃথিবীতে একা জ্ঞানলাভের সাধনা করার গর্ব ভোররাত্রে বজায় থাকেনি। চোখে পড়েছিল প্রতিবেশীর ঘরের জানালার ফাঁকের আলো। কানে এসেছিল বাঁধা সুরে শব্দ করে পরীক্ষার পড়া আবৃত্তি করার অস্পষ্ট অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ।

পরীক্ষা পাস করতে হবে না, তবু রাত জেগে আর রাত থাকতে উঠে বই পড়ে,— মোটা বই, কঠিন বই।

লোকে তো ভাববেই সে জ্ঞানের মস্ত বড়ো সাধক।

কিন্তু নিজে তো সে জানে, কেন তার পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বই পড়া !

না, বিদ্যার জন্য জ্ঞানের জন্য বইপড়ার সে আগ্রহ তার নেই।

গ্র্যাজুয়েটত্ব লাভ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে আশি টাকার একটা চাকরিতে গাঁথা হয়ে গিয়ে জ্ঞানী হবার বিদ্বান হবার সাধ, তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

এ তো জানা কথাই যে আর হবে না, জ্ঞানচর্চা এখন তার কেবলমাত্র অবাস্তব মানসচর্চা।

শেখার জন্য জানার জন্য কী সীমাহীন আগ্রহ আর ব্যাকুলতাই তার ছেলেবেলা থেকে ছিল।

লেখাপড়া শেখার সে কষ্টকর ইতিহাস মনে করলে আজ গা জ্বালা তো করে, হাসিও পায় !

সমগ্র বাস্তবতা ছিল তার বিদ্যালাভের বিরুদ্ধে, তবু সে নিজে চেষ্টা করে গায়ের জোরে বিদ্বান হবে !

বুদ্ধি ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, চেষ্টা ছিল। স্ক্রু-বল্টু আলগা হয়ে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া সেকেলে একটা ধীর মন্থর পরিবারের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শেখার জন্য, জ্ঞানলাভ করার জন্য, তার সক্রিয় উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোকে তারিফ করত।

বলত, এ ছেলে একদিন মস্ত বড়ো বিদ্বান হবে, মস্ত বড়োলোক হবে, মোটা মাইনের চাকরি করবে।

কীভাবে বাধা পেয়ে অসাধারণত্ব ঘুচতে ঘুচতে একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল বিদ্যালাভের সেই কামনা বাসনা !

চাকরি পেয়েছে ? এই বাজারে যেমন হোক একটা চাকরি ! লোকে তাই বলে। বাড়ির লোকে তো আরও বেশি জোর দিয়ে বলে। কত বেকার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা চাকরির জন্য, তার বন্ধু নন্দন আজ পর্যন্ত কিছু জোগাড় করতে পারল না।

সে একটা চাকরি পেয়েছে !

পরীক্ষা পাসের পুরস্কার শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এই, বেকারদের সঙ্গে তুলনায়। প্রথম বয়সটা গেল পরীক্ষা পাস করার ধান্ধায়, বাকি জীবনটা কাটবে জেলখানার কয়েদির মতো কলম পিষে।

তাও পরের জন্য।

খাওয়াপরা হাতখরচের জন্য পরের কাছে হাত পাততে হয় না, নিজের তার শুধু এই গর্বটুকু সম্বল।

আজ ছুটির দিন।

মাধবকে বইটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে। একটু আলোচনা ও তর্কও করে আসবে।

শিষ্যের মতোই করবে অবশ্য। অতবড়ো বিদ্বান লোকটার শিষ্য হবার যোগ্যতাও বুঝি সে এত সাধ নিয়েও অর্জন করতে পারেনি।

বিদ্যা আর জ্ঞানই আদর্শ মানুষটার।

অথচ ওই আদর্শবাদী বিদ্যা-পাগল মানুষটাকেও কত সামান্য টাকার জন্য চাকরি করে খেতে হয়, কত অমূল্য সময় আর শক্তি বিক্রি করতে হয় !

ছুটির দিনও ছেলেমেয়েদের চেঁচিয়ে পড়ার কামাই নেই। আশপাশে কয়েকটা বাড়ি থেকে কত রকমের গলাই যে কানে ভেসে আসে !

বাড়িতে পড়ছে বরেন।

পড়ে খুব, কিন্তু মাথা নেই। কোনোরকমে পরীক্ষা পাস করার বেশি কিছু ওর পক্ষে অসাধ্য।

মাথা থাকাটাই অবশ্য আসল কথা নয়।

মাথা থাকলেই যেন সবাই মাধবের মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারে পরীক্ষা পাস করায়, তার মতো পণ্ডিত হবার সুযোগ পায় !

দীননাথের ছেলেটা কী অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ই দিয়ে আসছিল স্কুলের পরীক্ষা পাস করায়। অল্প শিক্ষিত গরিব একজন দোকান-কর্মচারীর প্রায় অশিক্ষিত পরিবারে মানুষ হয়েও

ছেলেটার পরীক্ষা পাসের অদ্ভুত ক্ষমতায় মানুষ অবাক হয়ে থেকেছে। কেউ বলেছে এটা প্রকৃতির খেয়াল, কেউ বলেছে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, কেউ বলেছে পূর্বজন্মের বিদ্যা অর্জনের জের।

মাধবও এই স্কুলে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত তারটাই রয়ে গেছে স্কুলের সেরা ছাত্রের রেকর্ড।

মণ্টু এই রেকর্ড ভাঙতে পারে এমন কথাও কেউ কেউ ভেবেছে।

কিন্তু ঘরে-বাইরে অনেককে থ বানিয়ে দিয়ে শেষ ক্লাসে উঠবার পরীক্ষায় সে হয়ে গিয়েছিল থার্ড !

নিজের অসুখ-বিসুখ বা বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ, এ রকম কোনো কারণই ঘটেনি।

বরেনের কাছে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হতে চায়নি। বরাবর যে শুধু প্রথম হয়েই পাস করেনি, দ্বিতীয়জনের সঙ্গে ব্যবধান বজায় রেখে এসেছে একরাশি নম্বরের—তার এ কী রকম ধপাস করে অধঃপতন ঘটা !

সকালে নরেন গিয়েছিল ব্যাপার বুঝতে। দীননাথ আর মণ্টুর সঙ্গে সবে কথা শুরু করেছে, বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল হেডমাস্টার হৃদয়বাবু।

পরীক্ষা দিয়ে মণ্টু একদিনও স্কুলে যায়নি। হৃদয় তাই নিজেই ব্যাপার বুঝতে এসেছিল।

এটা কীরকম ব্যাপার হল তোমার ?

জানি না স্যার। বুঝতে পারছি না।

হৃদয় গম্ভীর মুখে বলেছিল, আমি বুঝেছি ব্যাপার। লেখাপড়ায় ঢিল দিয়ে অন্যদিকে মন দিয়েছ। অহংকাব বেড়ে গেছে তোমার, এত ভালো ছেলে, বেশি না পড়লেও ফার্স্ট হয়ে যায়।

লেখাপড়ায় একটুও ঢিল দিইনি স্যার। পড়ার সময়, বরং আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।

দীননাথ সায় দিয়ে বলেছিল, হাঁ, আগের চেয়ে বেশি পড়ে আজকাল।

আজ স্কুলে যাবি !

বলে হৃদয় গম্ভীর মুখেই চলে গিয়েছিল।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে দীননাথ হাসিমুখে বলেছিল, এত ভড়কে যাবার কী হল ? এ রকম হয়ে যায় দু-একবার।

নরেন বলেছিল, উঁহুঁ, তা বললে হবে না। হয়ে তো যায়, কিন্তু কেন হয়ে যায় ? যাই ঘটুক তার একটা কারণ থাকবে তো ! মণ্টুর পরীক্ষা খারাপ হবারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।

মণ্টু বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝবার চেষ্টা করা যাক এসো। বরাবর পরীক্ষা ভালো হয়েছে এবার অন্যরকম হল কেন ? ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে সে কথা ভুলে যাও, শুধু ধরে নাও ফলটা অন্যরকম হয়েছে। কেন হয়েছে ?

দীননাথ ও মণ্টু দুজনেই তার মুখেব দিকে চেয়ে চুপ করেছিল।

বেজাল্ট বদলাতে পারে কী কবে ? দুবকমভাবে এটা সম্ভব। যে পরীক্ষা দেবে সে যদি বদলে যায় কিংবা তার পড়াশোনা করার রকমটা যদি বদলে যায়। তোমার যখন কিছুই হয়নি বলছ, মনোযোগ দিয়ে আরও বেশি সময় পড়েছ বলছ—তাহলে ধরে নেওয়া যায়, তুমি বদলাওনি। অ্যাদ্দিন যেভাবে পড়ছিলে তাতে নিশ্চয় কোনো একটা গোলমাল হয়েছে।

আরেকটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে এসেছিল কারণটা। খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল মণ্টুর থার্ড হওয়ার রহস্যের বাস্তব মানে।

মণ্টুর বন্ধু সমীর। মণ্টু অসাধারণ ভালো ছেলে বলেই অবশ্য বন্ধু। তাদের দুজনের বাড়িতে তফাত অনেক।

সমীরদের শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবার। তার দিদি রমলা কাউকে বিয়ে করার বদলে স্কুলে টিচারি নিয়েছিল। সকালে সে ভাইকে পড়াত।

মণ্টু হাজির থেকে তার পড়ানো শুনত—চুপচাপ শুনত ! শোনাই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ট।

কারণ সাধারণ ছাত্র সমীরকে রমলা এমনভাবে পড়াত যেন তার মাথাটা মণ্টুর মাথার মতোই সাফ।

তাছাড়া মাঝে মাঝে নিজে থেকে মণ্টুকে এটা ওটা প্রশ্ন করে তাকে পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগও দিত।

তারপর হঠাৎ একদিন রমলা দীনেশকে বিয়ে করে চলে গেল স্বামীর ঘরে।

সমীর ও অন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য যত টাকা খরচ করা দরকার তার অনেক বেশি খরচ করতেও কোনো অসুবিধে নেই সমীরের বাবার। অন্য ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়াবার জন্য মাস্টার ছিল, তবু সমীরের জন্য ভিন্ন একজন মাস্টার রাখা হয়েছিল।

রমলার ছিল খানিকটা খেয়াল, খানিকটা স্নেহ। এমন চটপট কঠিন পড়া বুঝে নিত মণ্টু, যে ভাইকে উপলক্ষ করে তাকে পড়াতে সে আনন্দ পেত। কিন্তু একজন তার নিজের ছেলেকে পড়ানোর জন্য মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখলে কী করে তার পড়ানো শুনতে যাওয়া যায় ?

একপাশে বসে চুপচাপ শুনতে চাইলেও ?

নরেন সব শুনে বলেছিল, তবে ? সমীরের দিদি খুব যত্ন নিয়ে ভালো করে পড়াতেন না ?

জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন।

তবে ? একজন টিচার নিজের ভাইকে পড়ানোর সঙ্গে তোমাকেও দরদ দিয়ে সব জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিতেন—তুমি রোজ তা শুনতে। সেটা বন্ধ হলে ফল ফলবে না ? তুমি নিজে নিজে পড়ে ফার্স্ট হবে—তাই কখনও হয় ? কেউ তা পারে না। যতই মাথা থাক, শুধু স্কুলে পড়ানো শুনে পরীক্ষায় থার্ড ফোর্থ হওয়ার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করা যায় না।

মণ্টু বিহ্বলের মতো বলেছিল, কেন ? আমি তো সব বুঝতে পারি !

তা পারবে না ? স্কুলে সাধারণ ছেলেদের সাধারণ পাসের পড়া পড়ানো হয়, সে তো তুমি বুঝতে পারবেই ! ফার্স্ট হতে হলে আরও বেশি করে, কঠিন করে পড়ানো বুঝতে হয়, অনেকরকম ছোটোবড়ো কায়দাকানুন জানতে হয়, শিখতে হয়। এ কী সস্তা লেখাপড়া পেয়েছ, শুধু স্কুলে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে ফার্স্ট হয়ে যাবে !

দীননাথ কথাটা বুঝেও কাতরভাবে একটা প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কথাটা কী রকম হল ? কত ছেলেকে বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়ানো হয়, তাদের মধ্যে কতজনা ফেল করেও যাচ্ছে তো ?

নরেন বলেছিল, তা যাচ্ছে বইকী। শুধু দশটা মাস্টার রাখলেই আবার হয় না, ছেলেমেয়ের পাস করার ক্ষমতাটাও থাকা চাই।

মণ্টু হঠাৎ বলেছিল, আমি সমীরকে ধরব, ওর বাবাকে বলে-কয়ে রাজি করাব। মাস্টারের পড়াবার সময় একপাশে বসে চুপচাপ শুধু শুনব—একটি কথা বলব না, টুঁ শব্দটি করব না।

নরেন আর কিছু বলেনি।

সে জানত ও রকম ব্যবস্থা করে নিতে পারলে কিছু উপকার হয়তো মণ্টু পাবে কিন্তু আসল কাজ হবে না।

সমীরের মাস্টার তাকে পড়াবে সাধারণ পাসের পড়া, সে পড়ানো শুনে মণ্টুর ফার্স্ট হবার সুবিধা বিশেষ কিছু হবে না।

পড়ানো শোনার ব্যবস্থা মণ্টু করেছিল।

সমীর বাপের আদুরে ছেলে, সে নাকি বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে মণ্টুকে সাথে নিয়ে পড়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে, সে কাছে না থাকলে তার কিছুতেই পড়ায় মন বসে না।

ভুবন মণ্টুকে অনুমতি দিয়েছিল।

কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় মণ্টু আবার থার্ড হয়ে গেছে !

যোগেশের বাড়ির পাশের সরু গলি দিয়ে পিছন দিকে দীননাথের বাড়ি।

মাধবের বইখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে নরেন মণ্টুকে ওই সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। কয়েকটি ছেলে মার্বেল খেলছে—মণ্টুর আজ খেলায় মন নেই।

খবর কী মণ্টু ?

মণ্টু বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ে।

চলতে চলতে নরেন ভাবে, সে ইচ্ছা করলে ওকে ফার্স্ট করিয়ে দিতে পারে।

অলস অর্থহীন মানস-চর্চা স্থগিত রেখে তার সিকি ভাগ সময়ও যদি সে খরচ করে ওর পেছনে—টেস্টে আবার ও ফার্স্ট হবে।

স্কুল ডিঙানোর পরীক্ষাতেও আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারবে।

কিন্তু তারপর ?

তারপর কী হবে মণ্টুর অসাধ্য সাধনের চেষ্টার ? কে তাকে পরের পরীক্ষাগুলির জন্য তৈরি করবে ?

সকাল প্রায় নটার সময় মাধব বই থেকে মুখ তোলে।

মানসী কথা বলার সাহস ও সুযোগ পায়।

মাধবকে দেখেই এখন টের পাওয়া যায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে তন্ময় হয়ে পড়ার ঘোরটা তার কেটে গেছে।

সারারাত পড়েছ—

মানসীব সুরটা রাগ আর অভিমান মেশানো অনুযোগের।

সারারাত ? তুমি সারারাত জেগে থেকে আমায় পড়তে দেখেছ নাকি ?

এগারোটায় শুনলাম, দেখলাম পড়ছ। পাঁচটায় উঠলাম, তখনও দেখলাম পড়ছ। সেই একভাবে বসে। সিগারেটের ছাই যা জমেছে দেখছি একটা উনানের ছাইয়ের চেয়ে কম হবে না। এ সব দেখে মনে হবে না, তুমি হয়তো সারারাত ঠায় জেগে পড়েছ ?

তা মনে হতে পারে বটে !

তামাশা করছি না।

নিশ্চয় না।

মানসী আলগা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে দেয়।

নটা বাজে। ভোরে চারু উনানে খোঁচ দিয়ে গেছে, সেই থেকে নিজের মনে উনান জ্বলছে। শুধু কয়লা চাপিয়ে যাচ্ছি। চারবার না পাঁচবার শুধু তোমার চায়ের জল ফুটল, ব্যাস।

কেন ?

কাল রেশন আনোনি ! আজ এখনও বাজার এলো না। থলি খালি ঝুড়ি খালি, উনানে চাপাব কী ?

এতক্ষণ বলনি কেন ?

মুখে শুধু একটা বিষণ্ণ কাতর নালিশের ভঙ্গি ফোটে মানসীর। মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না।

মাধব শেষ সিগারেটটা ধরায়।

মানসীর মুখের ভঙ্গি আর নীরবতা দুয়ের মানেই সে জানে। তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে দেখে কিছু বলতে মানসী সাহস পায়নি।

বই বন্ধ করে সমাহিতের মতো চিন্তা করার সময়ও, রেশন আর বাজারের কথা জানাতে সাহস পায়নি।

প্রত্যেকবার না হোক, ওই অবস্থায় ডাকলে, কী প্রচণ্ড রাগটাই যে মাঝে মাঝে মাধব দেখায় !

সচেতন হয়ে নিজের মনে তাকে হাসতে দেখে, এদিক-ওদিক চাইতে দেখে, কথা কইতে গেলেই আর তার বোমার মতো ফেটে পড়ার সম্ভাবনা নেই জেনে, মানসী সাহস করে তাকে রেশন আর বাজারের প্রয়োজনটা জানাতে এসেছে।

রাগ আর অভিমান দেখাতেও সাহস পেয়েছে।

মানসীর মন না জোগাক, তার মন সে জানে।

এমনই তাকে সে মোটেই ভয় করে না। তার সাধারণ রাগ বা ধমকের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। মানসী ভালো করেই জানে যে সজ্ঞানে যতই রাগুক তাকে ধমক দেবার সাহস মাধবের হবে না।

তর্ক করবে ঝগড়া করবে রাগারাগি করবে—তার সঙ্গে সমানভাবে করবে। তার বেশি নয়।

কিন্তু পড়া আর চিন্তা করার সময় অন্য এক জগতে তলিয়ে গিয়ে সে হয়ে যায় একেবারে অন্য মানুষ।

সে যেন কুকুর বেড়াল, এমনইভাবে তার উপর মাধব খেঁকিয়ে উঠতে পারে শুধু তখন, যখন সে তন্ময় হয়ে পড়ে কিংবা খাতায় নোট লেখে কিংবা একদৃষ্টে দেয়ালের দিকে চেয়ে ভাবে।

পাগলের মতো তার ও রকম খেঁকিয়ে ওঠাকে মানসী কেন ভয় করে, ও রকম অসভ্য আচরণ কেন চুপচাপ সহ্য করে যায়, সহজভাবে কথাবার্তা চলার সময় ওই ধমকানির কথা উল্লেখ করে একটু অনুযোগ অভিযোগ পর্যন্ত সে কেন জানায় না, তাও মাধবের অজানা নয়।

পড়া আর ভাবা নিয়ে তার ও রকম তন্ময় হতে পারাকে মানসী শ্রদ্ধা করে, মুনিঋষির তপস্যা ভঙ্গ করার মতো ও সময় বিরক্ত করলে, তার একেবারে খেপে উঠে তাকে ভস্ম করে ফেলতে চাওয়া সংগত মনে করে। বোমার মতো ফেটে পড়ে গাল দিয়ে তাকে যে মাধব প্রায় মারতে উঠতে পারে এটাই তার কাছে সব চেয়ে অকাট্য প্রমাণ যে মাধবের জ্ঞানচর্চায় ফাঁকি নেই, সত্যই জ্ঞানের জন্য তার অকৃত্রিম সাধনা !

নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাওয়া, একাসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া, কোনো কোনো রাত্রে ঘুমকে সম্পূর্ণ বর্জন করা, এ সবেরও চেয়েও ওটাই বড়ো প্রমাণ। কত বড়ো কত দামি চিন্তায় কত ব্যাঘাত ঘটলে, তবেই না একটা মানুষ ওভাবে রেগে উঠতে পারে !

অন্য কেউ নয়, তার উপরে রেগে উঠতে পারে।

মাধব অসাধারণ মানুষ বইকী।

সে জন্য মানসী হয়তো গর্বও বোধ করে মনে মনে।

খুব রাগ হয়েছে, না ?

আমার আবার রাগ ?

অভিমান ? অপমান ?

নটা কিন্তু বাজল।

মাধব সুর পালটায়।

আচ্ছা, চুপ করে বসে না থেকে একটা কার্ডের রেশন নিজে আনতে পারতে না ? কাছেই তো দোকান। ভাত সেদ্ধ হতে ঘণ্টা দেড়েকের কম লাগে না, ভাতটা হয়ে থাকত। সত্যি করে বলো তো, রেশনের দোকানে যেতে লজ্জা করে, না অপমান বোধ হয় ?

কিছুই হয় না। কত বাড়ির মেয়েরা রেশন আনছে।

তবে আনোনি কেন ?

উপায় ছিল না বলে। শুধু কী চা ? বারেবারে কত কী হুকুম চালাও খেয়াল তো থাকে না। বই থেকে মুখ পর্যন্ত তোল না। এটা দাও, ওটা করো—সঙ্গে সঙ্গে না হলেই তো আমার দফা নিকেশ।

না, তেমন ঝাঁঝ নেই মানসীর কথায়।

মাধবের জ্ঞানের সাধনায় সে-ও যে কাজ লাগে এটা জানিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে সে যেন খুশিই হয়েছে মনে হয়।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে মানসী বলে, হয়েছে আজ রেশন আনা বাজার করা !

কে ?

নরেনবাবু।

মাধব হেসে বলে, ভয় নেই, তোমার দায় না সেরে বসব না। তোমরা গল্প করো, আমি ঘুরে আসছি।

নরেনের মুখের স্বাভাবিক রুক্ষতার ছাপটা আজ আরও বেশি স্পষ্ট মনে হয়। বোধ হয় দাড়ি না কামানো আর চুলে তেল না দেবার জন্য। রাতজাগার জন্যও হতে পারে।

একতলার ভাড়াটে অনাথের মেয়ের জিম্মা থেকে মাধবের ছোটোছেলেকে সে কোলে করে এনেছিল, মানসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মায়ের কাছে আসবার জন্য কাঁদছিল। কিছুতে ভুলবে না তবু বেলা ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। মেয়েটা কী ? এটুকু বুদ্ধি নেই যে মা-র জন্য কাঁদছে, মা-র কাছে দিয়ে আসি ? আমি জোর করে কেড়ে নিয়ে এলাম।

মানসী বলে, ওর দোষ নেই। আমিই ওপরে আনতে বারণ করেছিলাম—বলেছিলাম আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

নরেন আশ্চর্য হয়ে যায়।

কেন ?

ছেলে কাঁদলে ওনার কাজের ব্যাঘাত হয়, চটে যান।

নরেন বলে, ও !

তারপর বলে, তাহলে মেয়েটাকে খুব ভালোই বলতে হবে, এমনই পরের ছেলে সামলায়।

মানসী একটু হাসে।—বিনা স্বার্থে কী আর সামলায় ?

ওর স্বার্থটা কী ?

পড়া বলে দিই, গান শেখাই। নইলে ওর কীসের গরজ এতক্ষণ আমার ছেলে সামলাবে ?

নরেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাধবের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধব নির্বিকারের মতো বলে, ও কাঁদলে চটে যাই নাকি ? তা তো আমি জানতাম না !

মানসী বলে, জানবে কী করে ? কেন চটে যাও পরে তো আর মনে থাকে না তোমার। কাজের সময় খোকা কেঁদে উঠলে আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাই, নয় তো নীচে দিয়ে আসি।

নরেনের সামনে এ প্রসঙ্গের জের টানতে চায় না বলেই বোধ হয় টেবিলে সদ্য শেষ করা মোটা বইটার দিকে একনজরে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে মাধব তাকে বলে, আপনাকে একটু বসতে হবে। আপনারা কথা বলুন, আমি বাজার আর রেশনটা নিয়ে আসি।

নরেন বলে, বাজার আবার রেশন ! অনেক টাইম লাগবে যে ? তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, আমি একটা সারি আপনি আরেকটা সারুন।

মাধব বলে, অতি উত্তম প্রস্তাব।

মানসী হেসে বলে, আমার সঙ্গে গল্প করার চেয়ে বাজার করা রেশন আনাও বুঝি ভালো লাগে ?

নরেনও হেসে বলে, দরকার পড়লে লাগে বইকী ! আপনার সঙ্গে গল্প করলে আপনার সময় নষ্ট, আপনার কাজটা করে দিলে বরং আধঘণ্টা সময় বাঁচবে।

আমার কাজ !

আপনার জন্যেই তো। নইলে মাধববাবুর কী আর বাজাব করা রেশন আনার গরজ থাকত ? হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসতেন।

মাধব প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, মোটেই তা নয়। উনি বাপের বাড়ি গেলে আমি নিজে রান্না করে খাই।

নরেন বলে, বউদি তাহলে বাপের বাড়িও যান ? দু-একদিনের জন্য বোধ হয় ?

রেশনের সোজা হিসাব, বাড়ির বাজারের হিসাবটা মাধব ভালো জানে—মাছ তরকাবি কী আনতে হবে, কতটা আনতে হবে। মাধব তাই থলি হাতে বাজারে যায়, নরেন যায় রেশন আনতে।

রেশন হপ্তার তিন দিন চলে গেছে। আপিস খোলা, বেলাও হয়েছে। দোকানটাও কাছেই। প্রার্থী কম থাকায় মাধবের অনেক আগেই নরেন রেশন নিয়ে ফিবে আসে।

বলে, দেখলেন তো, কী রকম পাকা হিসেব। রেশন আনাও হল, গল্প করার সময়ও পেয়ে গেলাম।

আপনি হিসেবি মানুষ, সব দিক বজায় রাখতে পারেন।

খোঁচা দিলেন মনে হচ্ছে ?

খোঁচাই দিয়েছি।

কারণ ?

কারণ আপনি সত্যি ভারী হিসেবি। ওঁর কাছে আপনি কী শিখছেন শুধু নামটাই জানি—কেন শিখছেন তাও বুঝিনে। যখন তর্ক করেন, কিছুই মাথায় ঢোকে না! কিন্তু আমি দেখেছি, উনি চটে উঠতে গেলেই আপনি ভারী চালাকি কায়দায় তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেন। কী বলেন তা বুঝি না কিন্তু আপনার চালাকিটা বুঝি।

নরেনের রুক্ষ মুখে হাসি দেখা যায় কদাচিৎ, সস্মিত স্নিগ্ধ তামাশা দুষ্টামি ইত্যাদি নানাধরনের নিঃশব্দ হাসি সে যেন ফোটাতেই জানে না অথবা তার মুখে আসেই না ও সব হাসি। সে যে হাসতে জানে মাঝে মাঝে তার হো-হো শব্দে ফেটে পড়া প্রচণ্ড হাসিতে তা টের পাওয়া যায়—গত বছর তিনেকের মধ্যে মাত্র কয়েকবার হলেও তার হাসির চোটে এ বাড়িটা যেন কেঁপে উঠেছে, নীচের তলার ভাড়াটেদের অংশ পর্যন্ত !

আজই যেন প্রথম বিস্ময়ে উত্তাপে গলে তার মুখে স্নিগ্ধ স্নেহময় হাসির নীরব ব্যঞ্জনা দেখা যায়।

তার মুখে এ রকম হাসি মানসী আজ পর্যন্ত দ্যাখেনি।

আপনি এত মন দিয়ে আমাদের তর্ক করা দ্যাখেন ? তর্কের মানে বোঝেন না, তর্ক করাটা দেখতে এত ভালোবাসেন ? মাধববাবু চটে উঠলে তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াটা আপনার চালাকি মনে হবে—কিন্তু কোনোরকম সস্তা চালাকি সত্যি ওটা নয়।

কেন নয় ? আমি স্পষ্ট লক্ষ করেছি ওনার মেজাজ একটু চড়ে গেলেই আপনি আর জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। উনি নরম হয়ে যা বলেন তাই মেনে নেন।

মেনে নিই না। চুপ করে শুনে যাই।

তার মানেই মন জোগান, তোষামোদ করেন। সেটাও ভারী চালাকি করে করেন। প্রথমে এমনভাবে দেখান যেন আপনার একটা খটকা লেগেছে, ভুল হয়েছে কি না আরেকবার ভেবে দেখছেন। তারপর আস্তে আস্তে নরম হতে হতে একেবারে চুপ হয়ে যান। অর্থাৎ উনি যেন না ভাবেন যে ওঁর রাগ দেখে চুপ করেছেন, ওঁর কথাটা মেনে নিয়েছেন ভেবে উনি যেন খুশি হন।

নরেন খুশি হয়ে বলে, আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা পালটে গেল। এবার বুঝতে পেরেছি কোন গুণে আমার গুরুটিকে দিনের পর দিন সামলে চলেন—শুধু সয়ে গিয়ে নয়।

তবে ?

কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে। বাস্তববুদ্ধি দিয়ে। তলিয়ে না বুঝলে কাণ্ডজ্ঞান জন্মায় না। তলিয়ে বুঝতে হলে বুদ্ধি দরকার হয়। এই বুদ্ধিটুকু আপনার আছে জানা গেল। আমার বেলা মাধববাবু যেমন বুঝতে পারেন না আমি মানিয়ে চলছি, মত মানছি না—আপনার বেলাতেও বুঝতে পারেন না যে, আপনি ভয় করেন না, মানিয়ে চলেন।

কথা বলতে বলতেই মানসী দায় সামলাচ্ছিল। ছেলেকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে রেখে, জ্বরে নিঝুম বছর সাতেকের মেয়েকে একদাগ রঙিন মিক্শ্চার খাইয়ে বছর ছয়েকের বড়োছেলের গায়ে এখন তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল। সে ইনফ্যান্ট স্কুলে পড়ে।

মানসী বলে, ছেলেমেয়ের দিকে বেশি তাকাতে পারি না, যত্ন হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোধ হয় পাঁচ-দশমিনিটের বেশি ওঁর খেয়াল থাকে না যে বাচ্চারা আছে। বিদ্বান হলে কী মানুষ স্বার্থপর হয় ?

শিষ্যের কাছে গুরু-নিন্দা করছেন ?

গুরুপত্নী হিসাবে করছি।

নরেন একটু চুপ করে থেকে বলে, স্বার্থপরতা বলা যায় কি ? ওনার নিজের জন্য তো জ্ঞানচর্চা নয়। বিদ্যার জন্য আদর্শের জন্য এ রকম মেতে থাকলে বোধ হয় স্বার্থপরতা হয় না।

মানসী চোখ তুলে তাকিয়ে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে প্রশ্ন করে, আপনি এ যুক্তি মানেন ?

নরেন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জবাব দেয়, না। বিদ্যা বা আদর্শ কারও নিজের স্বার্থ নয়, এই অজুহাতে স্বার্থপরতা চলে না।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসে।

মাধবের অগোচরে তার সম্পর্কেই একটা যেন বোঝাপড়া হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। খোলাখুলি বোঝাপড়া, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যেই যেটা সম্ভব হয়ে থাকে। পরামর্শ করে তারা যেন ঠিক করে ফেলল, যে মাধবের সম্পর্কে অন্তত একটা দিকে তাদের মত মিলে গেছে—মানুষটা সে স্বার্থপর এবং দুজনেই তারা তার সঙ্গে মানিয়ে চলে।

নিজেকে শিষ্য বললেও মাধবের চেয়ে সমীর বয়সে পাঁচ-ছবছরের বেশি ছোটো হবে না। মাধব লেখাপড়া শিখেছিল এক মাসির টাকায়, মাসি এক রকম জোর করে ছাত্র অবস্থাতেই তার বিয়ে দিয়ে

দিয়েছিল। গুরুশিষ্য তারা পরস্পরকে আপনি সম্বোধন করে। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারও তাদের মোটেই গুরুশিষ্যের মতো নয়, প্রায় সমবয়সি দুজন পরিচিত মানুষের মতো।

তর্ক করতে করতে মাধব চটে যায় বটে, সেটা কিন্তু মূর্খ শিষ্যের বেয়াদবিতে গুরুর চটে যাওয়া নয়। জগতের সেরা বুড়ো জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসে মাধবের মতামতের বিরুদ্ধে তর্ক জুড়লে তাদের উপরেও চটে উঠতে মাধবের বাধত না। বুদ্ধির জড়তা এবং তার যুক্তি না মানার অজ্ঞতা একেবারেই সহ্য হয় না মাধবের।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাধব ফিরে আসে। থলির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় তরিতরকারি সে এনেছে অতি সামান্যই। তবে হাতে ঝুলিয়ে এনেছে মস্ত একটা ইলিশ মাছ।

বাজারের থলিতে এত জায়গা খালি থাকতে, থলির মধ্যে মাছটা রেখে হাতটা খালি করার বদলে, মুখে সুতো বাঁধা মাছটা হাতে ঝুলিয়ে এনেছে কেন, বুঝতে নরেনের অন্তত দেরি হয় না।

ভুলো মন বলে নয়। হিসেবি মন বলেই।

সে চায় দশজনে চেয়ে দেখুক, দেখবে সে কত বড়ো একটা মাছ কিনে এনেছে তার বউ আর ছেলেমেয়ের জন্য।

দশজনে জানবে, মানুষটা সে নিজের সংসার সম্পর্কে নিষ্ঠুর রকম উদাসীন নয়। দশজনে বুঝবে, যতই সে পুঁথিপত্রে মুখ গুঁজে সকলকে এড়িয়ে চলুক, মানুষটা সে তাদেরই মতো সংসারী। সংসারের জন্য সে বাজারেও যায়, এত বড়ো একটা ইলিশ মাছও কিনে আনে।

কিন্তু ইলিশ মাছটা দেখে মানসী যেন খেপে যায়।

মাধবের হাত থেকে মাছ আর থলিটা নিয়ে রান্নাঘরে যাবার বদলে সেইখানে সেই বিদ্যামন্দিরে বইখাতায় স্তূপাকার টেবিলটার পাশে বাজারের থলিটা উপুড় করে দেয়।

মাধবের আনা বাজার দেখে নরেনেরও হাসি। মানসীর রাগটাও সে সমর্থন করে। কিন্তু একটা কথার মানে ভেবে পায় না। যতই আপনভোলা কাছাখোলা লোক হোক, বাজার তো বরাবর মাধব নিজেই নিয়ে আসে। এতদিন বাজার করেও তার কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না, মাছ তরকারি কেনার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য দরকার হয় !

দুটো আলু আর একটা বেগুন ? কপি পেলে না ? শাকপাতা পেলে না ? লাউ কুমড়ো পেলে না ? তোমার সয় না, তুমি ভালোবাস না, তাই বলে আমরাও কী খেতে পারব না ?

আশ্চর্যের বিষয়, নরেনের সামনে এ রকম ধমক খেয়েও মাধব রাগ করে না।

হাসিমুখে বলে, কী হল জানো ? প্রথমে মাছটা কিনে ফেললাম। তারপর পকেটে হাত দিয়ে দেখি পয়সা বেশি নেই। তরকারি কম কিনতে হল।

নরেন এবার হেসে ফেলে।

তরকারি কম কিনতে হল ! তরকারি কেনার নিয়মরক্ষার জন্য দুটো আলু আর একটা বেগুন না কিনলেই হত ! মানসীরও রাগ করার কারণ থাকত না। এত বড়ো একটা ইলিশ মাছ এনেছে—মাছের ঝোল দিয়ে দিব্যি ভাত খাওয়া চলে।

মুখে যা-ই বলুক, উনানটাকে মানসী একেবারে মিছামিছি জ্বলে যেতে দেয়নি। কোনোরকম একটা ডাল যে ফুটিয়ে নিয়েছে, সম্ভারের গন্ধেই সেটা জানা গিয়েছিল। ডাল আছে, তার সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, ইলিশ মাছের ঝোল—এ তো রাজভোগ !

তবু তরকারি-প্রীতির অন্ধ সংস্কারের বশে দুটো আলু আর একটা বেগুন কিনে আনার কী প্রয়োজন ছিল মাধবের !

মানসীও পাতাল থেকে আকাশে ওঠার মতো হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, ধন্য মানুষ তুমি !

মাধবের কৈফিয়ত শুনেই রাগ যেন তার জল হয়ে গেছে। এমন যে বিদ্যাপাগল আপনভোলা মানুষ, তার উপর কী রাগ রাখা যায় !

নরেনের মনে জাগে আপশোশ সে-ই কি মানসীকে আজ উসকে দিয়েছে বেশি করে মানিয়ে চলার জন্য, সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ? মাধবকে নিয়ে আলোচনা করার সময় তার কথার এই মানেই কি মানসী বুঝেছে যে জ্ঞানের জন্য যে পাগল হয় তার অন্যরকম পাগলামি, চরম আত্মকেন্দ্রিকতা হোক, বা স্বার্থপরতা হোক, সে পাগলামিগুলিকেও মেনে নিতে হবে, প্রশ্রয় দিতে হবে ?

রাগ যদি নাই রাখা যায় কী দরকার ছিল অত বেশি রেগে যাবার ? মাধব একটা পাগলামি করে বসেছে এই কৈফিয়ত শুনেই রাগ জল করে দিয়ে এভাবে হেসে উঠবার ? এতে মাধব তো আরও বেশি পাগলামি করতে সাহস পাবে ! এভাবে নিজের জীবনটা নিজের কাছে অসহ্য করে তুললে শেষ পর্যন্ত কী উপায় হবে মানসীর ?

মানসী যায় মাছ কুটতে, তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে এসে মাধব বলে, আসুন আমরা বসি।

২

দর্শনের আরেকটা মোটা বই নিয়ে মাধবের বাড়ি থেকে বেরোবার সময়েও নরেন জানত সে বাড়ি ফিরে যাবে।

পথে নেমে মনে পড়ে যায় নন্দনকে।

নরেন নিজের কাছে লজ্জা বোধ করে।

এত ঢিলে হয়ে গেছে তার মন ? দরকারের চেয়েও মস্ত বড়ো একটা ইলিশ মাছ কিনতে পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ার চার পয়সার তরকারি কিনে বাজার সারা মাধবের পোষায়, মাধবকে মানায়। শুধু ছোঁয়াচ লেগে মাধবের মতো মহাপুরুষ হয়ে উঠলে তার চলবে কেন ?

কাল সে জানতে পেরেছিল যে তাদের আপিসে একটা নতুন পোস্টে একজন নতুন লোক নেওয়া হবে।

একেবারে যেন নন্দনেরই বয়স আর বিশেষ গুণাগুণ ইত্যাদি হিসেব করে সৃষ্টি করা নতুন চাকরি।

ভেবেছিল আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথেই নন্দনকে খবরটা দিয়ে যাবে—কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন লিখবে আর পেশ করবে, তাও জানিয়ে দেবে। সোমবার দশটায় নিজে নন্দন দরখাস্তটা দাখিল করে আসবে।

কিন্তু মোটা বইটার বক্তব্যে তার ছিল অনেকগুলি খটকা। সব চেয়ে জরুরি খটকাটা মনটা জুড়ে ছিল সারাদিন।

আপিস থেকে বেরিয়ে সে ওই কথাই ভেবেছে। রাত জেগে ওই বইটাই পড়েছে। সকালে তর্ক আর আলোচনার ভিতর দিয়ে মাধবের কাছে খটকাগুলির মীমাংসা করে নেওয়ার কথাই ভেবেছে।

বইয়ের নেশায় মেতে একেবারে ভুলে গেছে নন্দনকে।

ভুলে গেছে বন্ধুর চাকরির প্রয়োজন কত বেশি মারাত্মক বাস্তব সমস্যা। একটা চাকরির খবর জানলে বন্ধুকে খবরটা জানানো তার কত বড়ো গুরুতর কর্তব্য !

নন্দনের অদ্ভুত আশ্চর্য সহনশীলতার জন্যই কী এ রকম হয় ? এতকাল চাকরি জোটাতে না পেরেও ব্যাকুল হয় না, পাগল হয় না, ঘরে-বাইরে সমস্ত অপমান মুখ বুজে সয়ে যায়, নিদারুণ

অসুবিধাগুলি নিয়ে কখনও কারও কাছে নালিশ জানায় না,—এই জন্যই কি তারও খেয়াল থাকে না, যে যেমন তেমন একটা চাকরি জোটানো কী গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুর কাছে ?

মৃত বাপের জ্যাঠার সংসারে আশ্রিত নিরুপায়ের মতো অবজ্ঞা অবহেলা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করে—কিন্তু নন্দনের যেন দুঃখ নেই, অপমান নেই, আপশোশ নেই। অন্যায় অবিচার এমনভাবে সহ্য করে চলে, যেন গ্রাহ্যই করছে না।

বাপের এক ছেলে।

তার বাবা রমেশ মরবার সময় তার জ্যাঠা হেমেন্দ্রর কাছে সমর্পণ করে গিয়েছিল হাজার পাঁচেক নগদ টাকা, হাজার পনেরো টাকার জীবনবিমা, নন্দনের মা-র হাজার তিনেক টাকার গয়নাগাঁটি—আর পাঁচ বছরের নন্দনকে।

বাসনপত্র আসবাবপত্র ইত্যাদি আর সমর্পণ করে যেতে হয়নি, হেমেন্দ্র এমনিতেই দখল পেয়েছিল।

মরার সময় শুধু তাকেই যে বাবা, হেমেন্দ্রের হাতে সঁপে দিয়ে যায়নি, নগদ টাকা জীবনবিমা গয়নাগাঁটিও দিয়ে গিয়েছিল, বড়ো হয়ে এটা জানতেও কোনো অসুবিধাই ঘটেনি নন্দনের।

আত্মীয়স্বজন কতবার যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর তাকে জানিয়েছে, সমবেদনা দেখানোর সঙ্গে কত যে পরামর্শ দিয়েছে প্রতিকারের এবং প্রতিশোধের !

নন্দন চুপচাপ শুনে গেছে।

একমাত্র লেখাপড়ার ব্যাপারে ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সব রকম দুর্ব্যবহার চুপচাপ সয়েও গিয়েছে।

ছেলেটা সত্যি চালাক।

বিনা মাইনের ছোকরা চাকরের চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়েও সব সহ্য করে যায়, শুধু লেখাপড়ার ব্যাপারে করে প্রতিবাদ !

লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্য তার এই লড়ায়ের ইতিহাসটা নন্দন নিজেই নরেনকে সবিস্তারে জানিয়েছে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিয়েছে কেন মাথা নিচু করে সব সহ্য করে যেত, কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে উঠত ফুঁসে।

বলত, কেন ? বাবা মরার সময় বলে গেছেন, আমাকে লেখাপড়ার সব খরচ আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে নেই ভাবছেন ? পড়তে না দিলে আমি হাঙ্গামা করব কিন্তু বলে দিলাম !

মরবার আগে পাঁচ বছরের ছেলেকে বাপ কী বলে গিয়েছিল ছেলে সেটা মনে করে রেখেছে ! হেমেন্দ্র জানে এটা অসম্ভব, কিন্তু পাপীর মন ছায়াতে ভয় পায়, ইঙ্গিতে ভড়কে যায়।

হেমেন্দ্র বোধ হয় ভাবত, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই ছেলেটাকে, লেখাপড়ার খরচ ছাড়া আর কিছুই চায় না, ছেঁড়া জামাকাপড় মেনে নেয়, যা পায় তাই খেয়ে খুশি থাকে, মুখ বুজে ঠিক চাকরের মতো সংসারের কাজে খাটে—শুধু লেখাপড়া শিখতে চায়, শিখুক।

ছেলেটার মাথাও আছে।

ভালো রকম পাস করলে একদিন হয়তো ভালো চাকরি পাবে। সেদিন হয়তো লেখাপড়া শিখবার সুযোগ দেবার জন্য তাকে খাতির করবে, মাসকাবারে মাইনের টাকা হাতে তুলে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

অন্তত প্রথম কয়েকটা বছর তো করবেই !

হেমেন্দ্র কাটা কাপড় ছিটজামার একটা ছোটোখাটো দোকান চালায়। লোকে বলে, নন্দনের জন্য রেখে যাওয়া তার বাপের টাকা দিয়েই নাকি সে দোকানটা করেছিল।

তিনটি ছেলে মারা গেছে হেমেন্দ্রের। বড়োছেলেই কেবল বেঁচেছিল কিছু দীর্ঘকাল, তারই বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বুড়ো হেমেন্দ্রের সংসার। তেইশ বছরের গোবিন্দ ছাড়া ছোটো ছোটো তিনটি ছেলে আছে, ছবিরাণীকে নিয়ে দুটি মেয়ে।

নন্দন ভালোভাবেই পাস করেছে।

বিজ্ঞানে মাস্টার উপাধি পেয়েছে।

ভালোমন্দ একটা চাকরি কিন্তু নিজেও জোটাতে পারেনি অন্য কেউ জুটিয়েও দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত !

পাস করার পর তিন বছর ঘুরে গেছে কবে !

নন্দন বাজারের থলি হাতে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, বন্ধুকে দেখেই সে বলে, এই যে চাকরে মহাপুরুষ, আসুন ! আসুন !

রীতিমতো নালিশের সুর, বেশ ঝাঁঝ আছে কথায়।

নরেনের মনে হয়, বাড়ির মানুষের কদর্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বন্ধুর কাছে পর্যন্ত কখনও নালিশ জানাতে না বলেই নন্দন তার সামান্য ত্রুটি পেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে নালিশ জানাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারই কাছে !

প্রাণটা তো তার জ্বালা করে। জ্বালাটা প্রকাশ করার সুযোগ তো খোঁজে তার প্রাণ !

কদাচিৎ হয়তো দু-একটা দিন ফসকে যেত, নন্দনের সঙ্গে ছিল তার নিত্যকার মেলামেশা। চাকরি পাবার পর সেটা কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসেছে যে বাজারে একদিন নন্দনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর প্রায় একমাস পরে আজ আবার দেখা !

কিন্তু তাতে কী এসে যায় ?

কী কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবন-মরণের পরীক্ষায় পাসের নম্বর পাওয়া, তা কি নন্দন জানে না ?

দূরে যদি সে ভেসে গিয়েই থাকে স্রোতে, নন্দনও কি অবুঝ আত্মীয়স্বজনের মতো তাকে খোঁচা দেবে যে তার বন্ধুত্ব খাঁটি নয় ?

নরেন ক্ষুব্ধ হয়। তাই উদাসভাবে বলে, ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসিনি !

এত ব্যস্ত ছিলি, বিষম কর্মী মানুষ হয়ে গিয়েছিলি, এর মধ্যে ব্যস্ততা শেষ হয়ে গেল ? কর্ম ফুরিয়ে গেল ?

নন্দনের ঝালঝাড়ার চেষ্টা এবার খুশি করে নরেনকে। নন্দন তবে অভিমান করার, রাগ করার এবং সেটা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করার স্তরে নেমে এসে সাধারণ মানুষ হয়েছে, অংশীদার হয়েছে তাদের রাগারাগি ঠোকাঠুকি ভরা সাধারণ জীবনের ? কোনো বিষয়ে কারও কাছে ভুলেও কখনও নালিশ না জানানোর অসাধারণত্ব বর্জন করেছে ?

অ্যাদ্দিন গাধার মতো খাটছিলাম তাই। তোর কাছে না এসে রোজ সিনেমা দেখেছিলাম ভেবেছিস নাকি ? চাকরি করি আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বই পড়ি। কপাল মন্দ না হলে কারও এ রকম চাকরি জোটে !

তার মানে ? চাকরি পেয়ে চাকরির কাঙাল আমার কাছে কপালের নিন্দা ?

মানে তুই বুঝবি না—আগে চাকরি হোক।

এমন হঠাৎ আসার মানে তো আছে ?

বিশেষ দরকারে এসেছি।

বিশেষ দরকার ? আমার সঙ্গে ? আয় ভেতরে এসে বোস। চা কিন্তু পাবি না। আমার নিজের চা বন্ধ।

ঘরে গিয়ে তারা বসতেই ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় হাঁক আসে—নন্দন, তুমি আড্ডা জমালে আমি কী করে নেমন্তন্ন রাঁধব ? বাজারটা এনে দাও ? কোন ভোবে উনানে আঁচ দিয়েছি—

আরও কোমল মেয়েলি গলায় জোরালো প্রতিবাদ শোনা যায়, একজন বাড়ি এসেছে, পাঁচ-দশমিনিট বলুক না কথা ? তুমি বড়ো বাড়াবাড়ি করো মা।

ছবিরাণীর গলা ! জোর গলায় মার হুকুমের প্রতিবাদ করে সে তাকেও জানাচ্ছে যে দ্যাখো, তোমার মান রাখতে আমি কেমন মার সঙ্গেও লড়াই করি !

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে নরেন বলে, চা বন্ধ, না ? অ্যাদ্দিনে তাহলে মুখ তুলে দুটো কড়া কথা বাড়ির লোককে বলতে পেরেছিস !

নন্দন এবার একটু হাসে।

বুঝেছি। আজ হঠাৎ আমার মুখে নালিশ কেন জিগ্যেস করছিস তো ? অন্যায় মানি আর না মানি, আমি নালিশ জানি না। ভাবছিস তো আজ নালিশ দিয়ে শুরু করেছি কেন ? ঠিক ধরেছিস, তোর মতো বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা !

আমি ভাগ্য-টাগ্য মানি না।

বটে ! চাকরি পেয়েছিস বলে এখুনি তো মন্দ কপালের নিন্দে করছিলি, পাঁচ মিনিট আগে।

ওটা অভ্যাস—কথার কথা বলেছি। মনের দুঃখ প্রকাশ করেছি।

অভ্যাসটাই আসল। ভাসাভাসাভাবে তুই কি বড়ো বড়ো কথা ভাবিস আর ছাড়াছাড়াভাবে ভাগ্য না মানার দু-একটা কী প্রমাণ দেখাস—তাতে কী আসে যায় ? ফ্যাসাদে পড়লে ও সব খেয়াল থাকে না—ভাগ্য-মানার অভ্যাসটাই বড়ো হয়ে ওঠে।

নরেন বাধা দিয়ে বলে, আমার বিষয়ে লেকচার না ঝেড়ে নিজের কথা কী বলছিলি বলে শেষ কর না ?

নন্দন বলে, বলছি বলছি—তোর কথাটা আগে না বললে আমার কথাটা কিন্তু জমবে না।

নরেন বলে, আমি একটা চাকরির খবর এনেছি। আমাদের আপিসে একটা নতুন চাকরি সৃষ্টি করা হয়েছে। সোমবার দশটা বাজার আগে দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে গিয়ে হাজির হবি। কীভাবে কী লিখতে হবে স্লিপে লিখে এনেছি।

নন্দন প্রায় নির্বিকারের মতো শোনে।

নরেন বলে, শুধু তাতে হবে না। চাকরি হওয়ার ব্যাপার জানিস তো এ দেশে ? আজকেই মাধববাবুর একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করবি— বড়ো বড়ো ডিগ্রি আছে, তোর পেটে বিদ্যা আছে উনি এটা লিখে দিলে কাজ দেবে। তারপর যাবি তোর বাবার সেই যে উপরওলা ছিল বনমালীবাবু ?—তার কাছে। বাবার কথা বলবি, জোর করে চেপে ধরবি যে চাকরিটা করে দিতেই হবে। ওর সঙ্গে আমাদের আপিসের হারাণবাবুর খাতির আছে।

নন্দন চুপ করেই থাকে।

দরখাস্ত দিবি হারাণ ব্যাটার দপ্তরে, কিন্তু রেজেস্ট্রি করে দুলাইন একটা চিঠি পাঠিয়ে দিবি বড়ো সায়েবের কাছে। শুধু লিখবি যে চাকরিটার জন্য যথারীতি একটি দরখাস্ত যথাস্থানে পেশ করেছিস। নইলে হারাণ ব্যাটা দরখাস্ত চেপে দেবে।

এবার নন্দন একটু হাসে।

কিছু হবে না।

চেষ্টা তো করতে হবে ?

তা করতে হবে, তবে কিছু হবে না। বরং আমার কাছে খবর জেনে বনমালী চাকরিটা নিজের কাউকে বাগিয়ে দেবে।

এ সব সকলের জানা কথা, তর্ক করার কিছু নেই। নরেন তাগিদ দিয়ে বলে, তবু চেষ্টা করতেই হবে। এবার তোর কথাটা চটপট বলে বাজারে যা। এরা আবার চটাচটি করবে।

কেন ? চাকর নাকি আমি ?

ও বাবা ! তুই দেখছি ফোঁস করে উঠছিস !

নন্দন সহজভাবেই বলে, চুপ করে থাকাব সময় চুপ করে থাকতে হয়, আবার ফোঁস করার সময় হলে ফোঁস করতে হয়। দাদুর কাছে কাল পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলাম। একটা চায়ের দোকান দেব। দাদু পরিষ্কার বললে, লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি, টাকা রোজগার করে আনবি যা।

তা তো বলবেই ! সে তো জানা কথাই ! পাঁচটা টাকা চাইলে দেবে না জানিস, পঞ্চাশ টাকা তুই চাইতে গেলি কোন বিবেচনায় ?

নন্দন একটু হাসে।

বিবেচনা ঠিকই করেছিলাম। টাকা ক-টা ভিক্ষা চাইনি—দাবি করেছিলাম। কাল পর্যন্ত দাদুকে কোনোদিন টের পেতে দিইনি, বাবা আমার জন্য কী রেখে গেছেন, কত রেখে গেছেন আমি সব জানি। কাল প্রথম বললাম, দাবি করলাম বাবার টাকা থেকে আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই। কী বললে জানিস ? আমি নাকি নেমকহারাম, বজ্জাত ! বাবা যা রেখে গিয়েছিল আমার পিছনে কবে সব খরচ হয়ে গেছে—সাত-আটবছর আগে। এতদিন দাদুর টাকায় আমি খেয়েছি পরেছি লেখাপড়া শিখেছি।

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

তুই মেনে নিলি ? ঝগড়া করলি না ?

নন্দন বলে, ঝগড়া করলাম বইকী। কিন্তু মনে জোব পেলাম না, জোর গলায় কথা বলতে পাবলাম না। আমার পলিসিটাই আগাগোড়া ভুল ছিল। আগে ঝগড়া করলে, দশজন আত্মীয়স্বজনকে ডেকে মধ্যস্থ মানলে হয়তো কিছু ফল হত। লেখাপড়া শেখাব খাতিরে অ্যাদ্দিন চুপচাপ মেনে এসেছি যে, বাবা কিছু রেখে গেলেও দাদুই দয়া করে আমায় খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। পরীক্ষা পাস করাটাই মোক্ষম ধরেছিলাম—সেটাই হয়েছিল আসল ভুল।

একটু সে হাসে, দাদুর এক যুক্তিতে ভুলের মাশুল তাই উসুল হয়ে গেল। কথাটি কইতে পারলাম না।

কী রকম ?

দাদু বললে, ছ-সাতবছর বয়সের সময় আমার নাকি সাংঘাতিক অসুখ হয়েছিল। বাঁচা সম্ভব ছিল না। হাজার হাজার টাকা ঢেলে চিকিৎসা করে দাদু আমায় বাঁচিয়েছিল। আমি কী বুঝব ভাইয়ের ছেলে একটা দায় ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে মরে গেলে সেকেলে মানুষের কী অবস্থা হয়—আমরা তো একেলের নরাধম ছেলে। নিজের নাতি-নাতনির মরণ-বাঁচন তুচ্ছ করে দাদু আমায় বাঁচাবার দায় পালন করেছে। বাবা যা রেখে গিয়েছিল তাতে অবশ্য সাহায্য হয়েছে খানিকটা। তবু ক-জন করে এ রকম ?

নন্দন একটু থেমে বলে, ভাব দেখলে তোর ধাঁধা লেগে যেত। এমন করে আকাশের দিকে চেয়ে কথাগুলি বলছিল, যেন বাবাকে আকাশে দেখতে পাচ্ছে আর নালিশ জানাচ্ছে—তোমার দেওয়া দায় প্রাণ দিয়ে পালন করলাম, তোমার অকৃতজ্ঞ ছেলেটা কী বলছে শোনো ! কী নিয়ে ঝগড়া করব ? কোন যুক্তিতে বলব ছেলেবেলা আমার ও রকম অসুখ হয়নি, তুমি সব বানিয়ে বলছ ?

নরেন আশ্চর্য হয়ে বলে, কী বললি কথাটা ? তুই নয় ছোটো ছিলি, মনে নেই। হাজার হাজার টাকা খরচ করে তোর কঠিন রোগের চিকিৎসা হল—আত্মীয়স্বজন কেউ কিছু জানল না ? তারা তো বলতে পারবে সত্যি তোর অসুখ হয়েছিল কিনা, চিকিৎসায় হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছিল কিনা ?

নন্দন অদ্ভুত একটা মুখের ভাব করে চুপ করে থাকে।

নরেন রেগে বলে, তুই সত্যি বোকা। বলতে পারলি না কী অসুখ হয়েছিল, কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিল—

চুপ কর হাঁদা। ও সব বলতে হয়নি। বলবার আগেই দাদু সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে—আজে-বাজে তর্ক করিস না, বাপের গচ্ছিত কোটি টাকা পাওনা হয়ে থাকে, আদালতে গিয়ে আদায় কর। তার আগে সোজাসুজি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

তবু তুই বেরিয়ে যাসনি ?

কেন যাব ? বোকামি করে বিপাকে পড়েছি। তাই বলে আরও বোকামি করে আরও বেশি বিপাকে পড়ব ? অ্যাদ্দিন বোকার মতো সব সয়ে এসেছি, এখন বুঝেছি বলেই বোকার মতো তড়বড় করে সব নষ্ট করব ? অ্যাদ্দিন যখন সয়েছে, আর ছ-মাস একবছরও সইবে। প্রতিকার করব, শোধ নেব।

দেয়ালে মাথা ঠুকে ?

ভাঙা দেয়াল, এমনিতেই ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার মায়া না করে ঠিকমতো ঠুকতে পারলেই ধ্বসে পড়বে !

নরেন খানিকক্ষণ চুপচাপ ভাবে ! তার নিকটতম বন্ধু, কিন্তু এতদিন তার চরিত্রের বড়ো একটা দিকই তার জানা ছিল না। ওকে সে ভাবত ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। নিরীহ গোবেচারি বন্ধুটির জন্য বেশ খানিকটা অবজ্ঞার ভাবও বরাবর মনের মধ্যে পোষণ করে এসেছে।

আজ মনে হয়, সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, অন্যায় সহ্য করাটাও তো তেজের পরিচয় হতে পারে ! গোঁয়ার্তুমি করার জোরালো ঝোঁকটা সামলে অন্যায়কে একদিন ভেঙে চুরমার করার প্রয়োজনেই অন্যায়কে মেনে চলার মধ্যেও তো কম মনের জোর, কম তেজের পরিচয় থাকে না !

এটাও তো লড়াই করারই কায়দা। এগোবার জন্যই যখন পিছিয়ে যাওয়া দরকার তখন পিছিয়ে যাওয়া ?

নন্দন হিসাবে ভুল করে থাকতে পারে, পরীক্ষা পাস করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ধরে নেওয়ায় ঠকে গিয়ে থাকতে পারে—কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার যুদ্ধটা তো সে চালিয়ে গেছে ঠিকমতোই !

নন্দন বলে, কী ভাবছিস ? এবার ওঠ বাজারটা করে আনি।

নরেন শুনতে পায় না, একভাবে বসে থাকে। তার কানে ক্রমাগত ভেসে আসে অন্দরের রাগ বিরক্তি বাদ-প্রতিবাদের গুঞ্জন—ধমক-ধামকের মেয়েলি ও পুরুষালি গর্জন ! আর ছেলেমেয়ের এলোমেলো কান্না !

তার নাকে লাগে অন্দরেরই ডাল সম্ভারের ঝাঁঝালো গন্ধ—আধপচা মাছভাজার গন্ধ।

ছবিরাণীর গলার আওয়াজ কিন্তু মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না !

সে তাকে মনে মনে স্মরণ করেছে জেনেই যেন ছবিরাণী এবার নিজেই বৈঠকখানায় আসে। দুকাপ চা হাতে নিয়ে। বলে, বাজার আনতে আর দেরি করলে তো চলে না বড়দা। চা-টা খেয়ে চলে যাও।

চা খাব না।

বলে নন্দন গটগট করে বেরিয়ে যায়।

উদারতা দেখিযে মা-র তাগিদ ঠেকিযে সে তাদের কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল, ঠিক কথা ফুরিয়ে আসতেই নিজে এসে তাগিদ দিয়েছে বাজারের জন্য।

সে কী করে টের পেল তাদের কথা ফুরিয়েছে ?

কথা বলার সুযোগ দিয়ে আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল ?

তারা বৈঠকখানায় বসে কথা শুরু কবেছে টের পেয়েই গৌরী গলা চড়িয়ে হাঁক দিয়ে নন্দনকে ডেকেছিল—তাড়াতাড়ি বাজাব এনে দেবার জন্য।

তখন শুধু শোনা গিয়েছিল ছবিরাণীর গলা। মা-র হাঁকডাক দিয়ে হুকুম করাটা রদ করার জন্য গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করা।

তারপর থেকে ছবিরাণীর গলার একটি আওয়াজও সংলগ্ন বৈঠকখানায় পৌঁছায়নি।

বৈঠকখানাই বটে।

ঠাট পর্যন্ত বজায় রাখা যায়নি। ড্রেসিং টেবিলটা অন্দবে সরে গেছে, ছটার মধ্যে চারটে চেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে, জাপানি মাদুর বিছানো মেঝে হয়েছে অনাবৃত।

রাত্রে দুটো মশারির দুটো বিছানা হয়— পাঁচজন ঘুমায়। সকালে একঘণ্টার জন্য হয় সাতজন ছাত্রছাত্রীকে সনৎ মাস্টারের একঘণ্টা প্রাইভেট পড়ানোর যাত্রাপালা।

তারপর বৈঠকখানা খালি রাখা হয দোতলায় শয্যাশায়ী রমেন ডাক্তারের জন্য। ছবিরাণীর সে মেজো মামা। ভালো চাকরি করত—রোগে ভুগে ভুগে প্রায় পঙ্গু হয়ে চাকরি হারিয়ে হেমেন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

সে ডাক্তার নয, তবু ডাক্তারি করে।

যদি কোনো আবোগ্য-প্রার্থী আসে, পযসা দিযে ওষুধ ও আরোগ্য চায়—রমেন দামি শালটা গাযে জড়িয়ে অতিকষ্টে রোগীর ইচ্ছানুসারে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধেব ব্যবস্থা দিয়ে ওষুধের দাম আর এক টাকা ফি নিয়ে আবাব দোতলায নিজেব বিছানায় শুতে যায়।

এত বেলায় চা খাব না।

ছবিরাণী অবাক হবার ভান করে বলে, ও বাবা, চাকরি পেয়ে খালি পায়াই ভারী হয়নি, এ রোগও জন্মেছে ! বেলা দশটায় তৈরি চা সামনে ধরে দিলেও বাবুমশায় খেতে চান না !

নন্দনের চা জলখাবার বন্ধ হয়েছে। নন্দনকে না দিয়ে একা তাকে দেওয়া যায় না বলেই ছবিরাণী দুকাপ চা এনেছে। তার এই দয়া মেনে না নিয়ে নন্দন চা না খেয়েই চলে গেছে বাজারে।

চা খেতে তাই বিতৃষ্ণা বোধ হচ্ছিল নরেনের। কে জানে, নন্দনের মতো পাস করা বেকার হয়ে দিন কাটালে এ বাড়িতে তারও চা জুটত কিনা !

কলেজে পড়ার সময় জুটত।—চাকরি তখন ভবিষ্যতের ব্যাপার।

পাস করার পরেও কিছুদিন জুটত।—তখন চাকরির চেষ্টা চলছে।

এত লোকের চাকরি হয়, তারও হয়তো হবে !

তারপরে ক্রমে ক্রমে সকলের মনে আশঙ্কা জাগত যে চাকরি কী এর হবে ! এত লোকের চাকরি-বাকরি নেই, এও কি তবে সেই ভাগ্যহীন নিরুপায় বেকার দলের একজন ?

চা দিয়ে আপ্যায়িত করার আগ্রহ কমতে কমতে একদিন ঠিক নন্দনের মতোই তারও কপালে ঘটত চা-বন্ধের পরিণাম !

তবে ছবিরাণীর হাসিটা অগ্রাহ্য করা যায় না। নন্দনের সঙ্গে তার ব্যবহারও তেমন খারাপ নয়।

নন্দন তার বন্ধু বলেই ছবিরাণী নিজেকে সামলে চলে কিনা অথবা বেকার দাদাটির জন্য তার বুকে একটু মমতা থাকায় অপমান করতে পারে না, এটা অবশ্য জানা নেই নরেনের। এত ভেজাল

সংসারের মায়া-মমতায়, আপাতদৃষ্টিতে যে দরদকে মনে হয় আপনা থেকে উৎসারিত, তার মধ্যেও এত ফাঁকি যে অকারণে কেউ কাউকে স্নেহ করবে, এটা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না নরেনের।

চা খেতে খেতে নরেন বলে, নন্দনকে একটা চাকরির খবর দিয়ে গেলাম। হয়তো লেগে যেতে পারে।

বড়দার কিছু হবে না।

কেন হবে না ?

এত যার তেজ, এত যার রাগ, তার কখনও কিছু হয় ? কারও সঙ্গে মানিয়ে চলবে না, চব্বিশ ঘণ্টা গুম খেয়ে আছে। কে ওকে চাকরি দেবে ? চাকরি কী গাছে ফলে !

শুনে নরেন অবাক হয়ে যায়। এত তেজ ! এত রাগ !

নন্দনের ?

বাড়িতে বিনা মাইনের চাকরের মতো ব্যবহার যে মুখ বুজে বরাবর সয়ে এসেছে, তাকে খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য যথেষ্টরও বেশি টাকা তার বাবা রেখে গিয়েছিল জেনেও ?

এত হিসেবি নন্দন, পরীক্ষা পাসের জন্য হিসেব করে সে বাড়ির সকলের সঙ্গে ববাবর এমনভাবে মানিয়ে চলে এসেছে—ছবিরাণী তারই নামে নালিশ করছে যে সে দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না !

তাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে ছবিরাণী হেসে বলে, বন্ধুর নিন্দে প্রাণে বিঁধছে, না ? তোমার বন্ধুই শুধু নয়, আমার ভাইও তো বটে ! সেটা ভুলে যেয়ো না। সত্যি বড়ো বেয়াড়া মানুষটা। বাড়িতে থাকে কেমন করে জানো ? যেন থেকেও নেই, সবাই তার পব। সংসারের কোনো ব্যাপারে থাকবে না, কোনো বিষয়ে কথাটি কইবে না, হয় পড়বে নয় চুপচাপ গোমড়া মুখ করে থাকবে।

নরেন মরিয়া হয়ে বলে, তোমরা অনাদর অবহেলা কর বলেই বোধ হয় ও রকম করে।

ছবিরাণী তার হাসিভরা মুখের গালে হাত দেয়।

কী যুক্তিই দিলে ! বাপমরা ছেলে, বাপের জ্যাঠার ঘাড়ে খাচ্ছে পরছে, অনাদর অবহেলা জুটবে না তার ? সংসারের নিয়ম তো তাই ! ও সব সহ্য করেই হাসি মুখে থাকতে হয়। তাতে গুরুজন আর অন্য মানুষেরা খুশি হয়। ভাবে যে না, নিজের ছেলের সঙ্গে যে তফাতটা করা হচ্ছে সে জন্য ওর রাগ বা দুঃখ নেই। ও আমাদের পর ভাবে না। সব সময় গোমড়া মুখ করে থাকলে আরও চটে যাবে না গুরুজন ? আরও খারাপ ব্যবহার করবে না ?

তুমি সত্যি ভারী চালাক মেয়ে ছবি !

চালাক না হলে কি উপায় আছে নরেনদা ? যা দিনকাল, কত কিছু সইতে হবে তো ! পড়ছিলাম, একবার ফেল করলাম—বাস, পড়াশোনা বন্ধ। গান শিখছিলাম, গান শেখানোর খরচ বাড়ল,—বাস, গান শেখানো বন্ধ। কুড়ি বছর বয়স হল। বাপের ভাত খাচ্ছি, বাপের কাপড় পরছি। কত সইতে হয়, তুমি কী জানবে বলো ? পাস করে দিব্যি চাকরি বাগিয়ে গ্যাঁট হয়ে আছ। কিন্তু সইতে হয় বলে কাঁদব নাকি ? সারাদিন মুখভার করে থাকব ?

তা তো আমি বলিনি !

সোজাসুজি না বললেও রকমে-সকমে বলেছ। সব সময় হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করি কিনা, তোমরা ভাব কত সুখেই না আছে ছবিরাণী !

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ছবিরাণী বসে।

সুধাময় সরকারকে জান ?

তাকে কে না জানে ? আলাপ পরিচয় অবশ্য নেই। থাকার কথাও নয়। শুধু নাম শুনেছি।

ছবিরাণী হাসে।

এত বিনয় করতে নেই। কে বলতে পারে তুমিও একদিন ওর চেয়ে মস্ত বড়োলোক হবে না ? ব্যাপারটা বলি শোনো। দাদু একটা চাকরির খবর এনে সব ঠিকঠাক করে বড়দাকে সুধাময়বাবুর কাছে পাঠালেন। বলে দিলেন, গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে, জিজ্ঞাসা না করলে কোনো কথা বলবে না। যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দেবে। তারপর একসময় চাকরির কথাটা তুলে বলবে যে স্যার, আমায় চাকরিটা করে দিন, আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই শুনব। দুশো টাকার চাকরি। একবার ভেবে দ্যাখো ব্যাপারটা ? এই বাজারে দুশো টাকার চাকরি ! দাদুর কথা শুনলে নিশ্চয় হয়ে যেত।

এ ইতিহাস নরেনের অজানা নয়। ছবিরাণীর মন বুঝবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, কী চাকরি ?

খুব ভালো চাকরি। এত লোকের এত বড়ো আপিস চালাতে হয় সুধাময়বাবুকে, তার তো জানা দরকার কোথায় কী হচ্ছে, কে কী করছে। একলা কি খবর রাখা যায় প্রায় দুশো লোকের মধ্যে কে ঠিকমতো কাজ করছে, কে ফাঁকি দিচ্ছে ? বড়দাকে তাই দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতেন কে কী করছে না করছে, কাজ ঠিকমতো চলছে কিনা এ সব খবর পাওয়ার জন্য। এমন চাকরিটা বড়দা নিজের দোষে ভেস্তে দিল।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, ওটা কি ভদ্রলোকের কাজ ? ও তো স্পাইগিরি করা ? একটু মনুষ্যত্ব থাকলে টাকার খাতিরে এ চাকরি নেওয়া যায় না।

ছবিরাণী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, স্পাইগিরি ! স্পাইগিরি আবার কী ? কাজ করার জন্য সবাই মাইনে পাচ্ছে, কাজে কে ফাঁকি দিচ্ছে সেটা শুধু ধরিয়ে দেওয়া। ট্রামে যে ইন্সপেক্টর এসে টিকিট বিক্রির কাগজ দ্যাখে, সকলের টিকিট দ্যাখে।—সে কি স্পাই নাকি ? সবাই ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এইটুকু দেখার জন্য তাকে রেখেছে, সে-ও সেই কাজটুকু করছে।

নরেন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

তুমি ভুল বুঝেছ। ট্রামে-বাসে রেলগাড়িতে ইন্সপেক্টরের কাজ আর এ কাজটায় অনেক তফাত। কাজ ঠিকমতো চলছে কি না, কাজে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না, দেখার লোক সুধাময়ের আপিসে নেই ভেবেছ ? একজন নয়—কয়েকজন আছে, খোলাখুলিভাবেই আছে। ম্যানেজার, বড়োবাবু, অমুকবাবু তমুকবাবু এদের কাজই হল কেরানিদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটানো। নন্দনকে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতে চেয়েছিল কে কী বলছে, কে কী করছে, তলে তলে খবর নিয়ে চুপিচুপি জানাবার জন্য। আপিসের কাজের খবর নয়, কেরানিদের প্রাইভেট খবর ! বন্ধুর মতো সকলের সঙ্গে মিশবে আর সকলের হাঁড়ির খবর চুপিচুপি বড়োকর্তাদের কানে পৌঁছে দেবে।

মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় ছবিরাণী ধোঁকায় পড়ে গেছে। চাকরিটা ফসকিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য আজ কতকাল সে নন্দনের উপর ভীষণ চটে আছে, আজ হঠাৎ মত বদলানো বড়োই কঠিন মনে হয়।

সত্যি ? তুমি কী করে জানলে ?

আমি জানি। আমাদের আপিসেও এ রকম লোক আছে একজন। বেশি দিন তো গোপন রাখা যায় না, ধরা পড়ে যায়। সে ব্যাটা কাছাকাছি এলেই আমরা সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলি।

তবে তো বড়দার দোষ নেই।

নিশ্চয় দোষ নেই। বরং ওকে তারিফ করতে হয়। এ অবস্থায় হাতে পেয়েও দুশো টাকার চাকরি না নেওয়া কি চাট্টিখানি কথা ?

ছবিরাণী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তোমার মাইনে-টাইনে বাড়বে না ?

বাড়ছে ! কমে কিনা দ্যাখো।

ছবিরাণী এ কথাতেও হাসে। তবে হাসিটা তার তেমন তাজা মনে হয় না। হাসিখুশি থাকার নিয়মটা পালন করবার জন্যই সে যেন গায়েব জোরে হাসে।

সকালে নন্দন একবার বাজার করে এনেছিল। এত বেলায় আবার তার বাজার করতে যেতে হওয়ার কারণ গোবিন্দ। দোকান থেকে দীননাথকে দিয়ে সে খবর পাঠিয়েছে যে, দুপুরে তার খাতিরের দুজন লোক বাড়িতে খাবে—বিশেষভাবে যেন রান্নাবান্না করা হয়। মাংস না হলেও চলবে—কিন্তু কমপক্ষে দুরকম মাছ যেন হয়।

কাটাকাপড় ছিটজামার দোকান এখন গোবিন্দই চালায়। জোরালো উৎসাহ নিয়ে সে ব্যাবসা বাড়াবার জন্য কোমব বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে।

অল্পদিনে খানিকটা বাড়িয়েও দিয়েছে দোকানের বেচাকেনা।

বুড়ো হেমেন্দ্র অল্পবয়সি নাতির হাতে দোকান ছেড়ে দিতে গোড়ায় সাহস পায়নি।

বেশ চলছিল দোকানটা, আগের মতো না হলেও মোটামুটি চলে যাচ্ছিল।

গোবিন্দের মাথায় ঝোঁক চাপল দোকানটা বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে হবে, বড়ো ব্যাবসাদাবের হুকুমে দোকান চালিয়ে ভাড়া করা মজুরের মতো শুধু দোকান চালানোর মজুবি নিয়ে সে আর দোকান চালাবে না।

দোকানকে সে স্বাধীন করবে। স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করবে।

সে কি কেরানি ?

আপিসের কলম পেষা মজুর ?

তাদের নিজের দোকান।

তারা খুশিমতো চালাবে !

সত্তর বছরের বুড়ো হেমেন্দ্র বলেছিল, পারবি কি ? সামলে-সুমলে মিলিয়ে মিশিয়ে ? বড়ো দায, বড়ো ঝঞ্ঝাট। সব সয়ে গিয়ে হিসেবপত্র বুঝে পারবি কি চালাতে ?

কেন পারব না ?

হেমেন্দ্র বোধ হয় খুশি হয়েছিল, মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিল।

তেইশ বছরের নাতি তাকে মুক্তি দেবে তার দায় থেকে।

নিশ্চিন্ত মনে সে মরতে পারবে ! সত্তর বছরেব পোড়াকপালে চাপড় মেরে সে তাই বলেছিল, মানিয়ে চলাটা আসল কথা, সামলে চলাটা আসল কথা। ওদিকে ওই বড়োবাজারেব লোকগুলি ঠকাতে চাইবে, এদিকে খদ্দেররা ঠকাতে চাইবে। দুদিক বুঝেশুনে নিজের পাওনা-গন্ডা বুঝে নিলে তবেই কিন্তু দোকান চলে।

গোবিন্দ ভেবেছিল বুড়ো হেমেন্দ্র পিছনে থাকবে, সে নতুন করে ঢেলে সাজাবে দোকানটা।

হেমেন্দ্র ভেবেছিল, আর তো এড়ানো যাবে না মরণ।

গোবিন্দের ঘাড়েই চাপিয়ে যাই সব দায়।

তাই তো নিয়ম জগতের।

যৌবনকে দায় দিয়ে বড়োর মরণ বরণ করা।

তেইশ বছরের যুবক কী বুঝবে বুড়ো বয়সে কত ব্যাকুলতা জন্মে, একজনকে দায় সঁপে দিতে—শান্তিতে জীবন কাটাবার সুযোগ পেতে !

না বুঝুক। না বোঝাই ভালো। যৌবনে না জানাই ভালো। দেহমনে ঘনায়িত মৃত্যুকে কাছে নিয়ে অনুভব করেও জীবনের প্রতি কী মমতা জন্মায় ?

জীবনের নতুন মানিকদের কীভাবে শুধু বলতে সাধ যায় যে, জীবনের দিকে তাকাও, জীবনের দিকে তাকাও, মরণকে তুচ্ছ করে জীবনকে সর্বজয়ী করে দাও, জীবন থেকে বাতিল করে দাও মৃত্যুর নিয়মটা।

নাতির চেষ্টায় দোকানের খানিকটা উন্নতি হতে দেখেই তার হাতে সব ভার তুলে দিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

বয়স কম হয়নি, পট করে একদিন সে মরে গেলে গোবিন্দকেই দোকানটা চালাতে হত। বেঁচে থাকতেই চালাক।

দুজন কারা আজ বাড়িতে খাবে গোবিন্দ বলে পাঠায়নি—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি বাড়ির লোকের। কিছুদিন আগে বেশ বাবুগোছের দুজন লোককে এনে বেশ সমাদরের সঙ্গে গোবিন্দ ভোজ খাইয়েছিল।

বয়সে দুজনেই গোবিন্দের চেয়ে অনেক বড়ো—নগেনকে মাঝবয়সি বলা যায়। তার চেয়ে বিপিনের বয়স কিছু কম। দুজনেই কাপড়ের ব্যবসায়ী, বড়ো ব্যবসায়ী। হেমেন্দ্রর সঙ্গে কেবল জানাশোনা ছিল—গোবিন্দ একেবারে ভাব জমিয়ে বাড়িতে এনে ভোজ খাইয়ে খাতির করতে শুরু করেছে !

কী করে করেছে, সেই জানে !

পয়সাওলা লোক, বয়সে বড়ো, গোবিন্দকে এভাবে ভাব জমাতে দেওয়া, খাতির করতে দেওয়া, কোনো উপলক্ষ ছাড়াই গোবিন্দের ডাকে বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে রাজি হওয়া—একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া সকলের কাছেই এটা বড়ো বেখাপ্পা ঠেকেছে।

একটা অজুহাত অবশ্য খাড়া করা হয়েছে। এটা শখের খাওয়া নয়—দরকারের খাওয়া।

ভুবন ও বিপিন দুজনের বাড়িই শহরের প্রান্ত ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। সেদিন ব্যাবসা সংক্রান্ত বিশেষ কাজে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসার সময় ছিল না—গোবিন্দ তাই তাদের বাড়িতে এনে খাইয়েছিল।

তারা দুজনেই কোনোদিন নাকি হোটেলে কিছু খায় না, খেতে পারে না—তাদের ঘেন্না করে।

সাজপোশাক চেহারায় এ রকম খাঁটি শহুরে বাবুর মতো দেখতে—তারা হোটেল বর্জন করে চলে শহরের ! এ কথাটাও খাপছাড়া মনে হয়েছিল সকলের।

হোটেলে না খেলেও যেন তারা নিজেদের মধ্যাহ্ন ভোজনের একটা ব্যবস্থা করতে পারে না, একবেলা অন্নব্যঞ্জন ছাড়া অনাকিছু খেয়ে চালিয়ে দিতে পারে না !

একই লাইনের এত অল্পবয়সি এত ছোটো একজন ব্যবসায়ীর কাছে ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা পড়বে জেনেও, তাদের বাড়ি বয়ে এসে ছোকবার বাড়ির রান্না অন্নব্যঞ্জন খাওয়া চাই !

নন্দন যখন বাজার করে ফিরল তার একটু আগেই নরেন চলে গেছে।

বাজারে চাকরি সম্পর্কে নরেনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে হয়েছিল, বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে সে বেরোবার জন্য পা বাড়ায়।

গৌরী বলে, আবার যাচ্ছ কোথা ?

নরেনের কাছে যাব। চাকরিটার বিষয় একটু জানবার আছে।

একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। তোমার হাতে কালিয়াটা ভারী সুন্দর হয়, মাছটা রেঁধে দিয়ো।

শুধু কথা নয়, গৌরীর গলার সুর পর্যন্ত যেন মিষ্টি মনে হয় !

নন্দন চুপ করে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক রকম রোজই তাকে এটা ওটা রেঁধে দেবার হুকুম করা হয়, এতদিন কিন্তু গৌরীর বলার ভঙ্গি গলার আওয়াজটাই ছিল আলাদা।

কালিয়াটা তার হাতে ভালো উতরায় শুধু এই জন্যই যেন খুশি মনে গৌরী আজ ওই পদটা রেঁধে দেবার আবদার জানাচ্ছে ! হুকুম নয়, অনুরোধ !

তার চাকুরে বন্ধু তার নিজের আপিসে একটা চাকরি খালির সংবাদ দিয়ে গেছে। সংবাদটা শুনেই এই পরিবর্তন !

নন্দন বলে, তাহলে মাছটা রেঁধেই যাই।

না না, চাকরির বিষয়ে জানতে যাবে, ওটা আগে সেরে এসো। জরুরি কাজ আগে সারাই ভালো। শেষে ভুলে যাবে, নরেনের সঙ্গে দেখা হবে না—

থেমে গিয়েই গৌরী যোগ দেয়, তাছাড়া, ওরা তো খেতে আসবে সেই সাড়ে-বারোটা একটায়।

কতকাল পরে যে নন্দনের মুখে আজ একটু হাসি দেখা যায় !

ব্যস্ত হচ্ছ কেন বউদি ? তেমন কিছু জরুরি কথা নয়—পরে গেলেও চলবে। মাছটা কেটে দাও, রেঁধে ফেলি।

নগেন আর বিপিনকে নিয়ে গোবিন্দ আসে প্রায় দেড়টায়।

নন্দন বাইরের রোয়াকে বসে তারই মতো বেকার পাড়ার ছেলে ভূপেশের সঙ্গে কথা বলছিল। নগেন নন্দনকে জিজ্ঞসা করে, কেমন আছেন ?

আছি এক রকম।

কিছু হল ?

এটা ন্যাকামি—কিন্তু বেশ অমায়িকভাবেই নগেন প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। তার কিছু জুটে গিয়ে থাকলে গোবিন্দের কাছে জানতে যেন তার বাকি থাকত !

কই আর হল ?

বিপিন বলে, আপনাদের খালি চাকরি চাকরি বাতিক। ব্যাবসা করুন, চাকরি করে কি কিছু হয় ? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ ব্যাবসা করে খাচ্ছি, বড়ো বড়ো পাস দিতে আপনাদের বুদ্ধি কত ধারালো হয়েছে, আপনারা নামলে আমাদের হটিয়ে অনায়াসে ফেঁপে উঠবেন।

মাঝবয়সি মানুষটা তার সঙ্গে আপনি করে কথা বলে—এটা সত্যই তার পেটের বিদ্যার—তার এম এ পাস করার ক্ষমতার—সম্মান। নন্দন ভাবে, এইসব অল্পশিক্ষিত পয়সাওলা মানুষগুলি সত্যই কি ঈর্ষা করে গরিব বিদ্বানদের, তারা বেকার হলেও ?

এই ঈর্ষার জন্যই কি ম্যাট্রিক ফেল নগেন তার দোকানে খাতা লেখার কাজটা পর্যন্ত তাকে না দিয়ে নিজেব মতো অল্পশিক্ষিত একজন বুড়োকে বহাল করে ?

প্রাণটা আজও কটকট করে ঘটনাটা মনে করলে !

খাতা লেখার কাজ ? পাঠশালার বিদ্যায় যা করা যায় ? তাই সই !

নন্দন ছুটে গিয়েছিল উমেদারি করতে।

নগেন তাকে কাজটা দেয়নি।

বলেছিল, আপনি পারবেন না মশায়, এ সব কী আপনাদের কাজ ! আপনারা আপিসে কাজ করবেন।

আপিসে কাজ পাই না যে।

পাবেন পাবেন—চিরকাল কি মানুষের সমান যায় ? ও সব কী জানেন, কপালের কথা।

পোড়াকপালের কথা বললেও তবু তার কথার একটা মানে হত !

হেমেন্দ্র তাদের সাদরে সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানায়। বাড়িতে যেন দুজন মন্ত্রীর পদার্পণ ঘটেছে এমনিভাবে কাচুমাচু করে।

কথা বেশি বলে নগেন। বিপিন একটু চুপচাপ মানুষ।

আপনার নাতির সঙ্গে পারা যায় না মশায়। কাজের দায়ে একবেলা ঘরের ভাত নাই বা জুটল আমাদের—আপনারা কেন এত ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন ? দেখুন দিকি কাণ্ড। কিছুতে ছাড়বে না—বলে কিনা রান্নাবান্না সব হয়ে আছে, না এলে সব নষ্ট হবে। এ মোক্ষম যুক্তির তো কোনো কাটান নেই !

হেমেন্দ্র বলে, আপনাদের অনুগ্রহ। গোবিন্দের বড়ো ভাগ্য যে আপনাদের স্নেহ পেয়েছে।

সামনে বলা উচিত নয়—বুদ্ধিমান ছেলে। এ বয়সে অল্পদিনে ব্যাবসার কায়দা ঠিক বুঝে গেছে।

গোবিন্দ লজ্জিতভাবে একটু হাসে।

গৌরী ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করে। ছবিরাণীকে বিশেষভাবে আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সামনে আসা বারণ !

খেতে খেতে তারা সহজভাবে এ কথা ও কথা বলার চেষ্টা চালিয়ে যায়, কিন্তু অস্বস্তি বোধ চাপতে পারে না ! সকলেরই অস্বস্তি—তাদেরও, বাড়ির লোকেরও।

শুধু গোবিন্দই যেন সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ও স্বাভাবিক ধরে নিয়ে খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দ্যাখে !

কত সুস্পষ্ট সহজবোধ্য এই বিশেষ মানুষ দুটির এ বাড়িতে এভাবে বসে খাওয়ার অসংগতি আর অস্বাভাবিকতা ! ঠিক যেন একটা অন্যায় অসামাজিক ব্যাপার ঘটে চলেছে !

নন্দন ভাবে, ওরা কী সত্যই নাছোড়বান্দা গোবিন্দের আবদার এড়াতে না পেরে এভাবে এখানে খেতে এসেছে ?

আর কোনো মানে নেই তাদের আসার ? কিন্তু তাহলেও তো একটা বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়—এত জোর কেন গোবিন্দের আবদারের ? কেন ওরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না গোবিন্দের আমন্ত্রণ ? কেন ওরা গোবিন্দকে ক্ষুণ্ণ কবতে চায় না ?

গোবিন্দ ওদের সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। বিকালে নন্দন হাঁটতে হাঁটতে দোকানে গিয়ে গোবিন্দকে বলে, একটা কথা ছিল।

টাকাপয়সা নয় তো ?

আরে না—অন্য কথা।

জন দুই খদ্দের দোকানে বসেছিল, তাদের সামলাবার জন্য দীননাথ একাই যথেষ্ট।

গোবিন্দ রাস্তায় নেমে এসে বলে, কী কথা বড়দা ?

নন্দন কদাচিৎ দোকানে আসে, তার দোকানে আসাটা কেউ পছন্দ করে না। আজ হঠাৎ এভাবে এসে কথা আছে বলায় গোবিন্দ একটু ভড়কে গেছে।

নন্দন বলে, বলছিলাম কী তোর একটু সাবধান হওয়া দরকার। তোকে আমি ভালো করেই জানি, তুই কী প্ল্যান করেছিস ভেবেচিন্তে তাও বুঝতে পেরেছি। আমার উচিত তোকে সাবধান করে দেওয়া, আমি কিন্তু কর্তালি করছি না বাবু, আগেই বলে রাখলাম। আমার যা বলার আছে বলছি, শুনে তুই যা ভালো বুঝবি করবি, আমি আর কথাটিও কইতে আসব না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার এই লম্বা ভূমিকায় গোবিন্দ আরও ভড়কে গেল। দাদাকে সে এতটুকু গ্রাহ্য করে না—কেন করবে ? কিন্তু যতই হোক এম এ পাস করা দাদা তো, বোকাহাবা নয়। সে যখন

এমনভাবে তাকে সাবধান করে দিতে এসেছে, ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর ! তাও আবার বাড়িতে কিছু না বলে দোকানে বলতে এসেছে !

গোবিন্দ ওই কথাই বলে, কথাটা গুরুতর বলছ, বাড়িতে না বলে দোকানে এসে—

বাড়িতেও বলতে পারতাম। আজ না হয়, কাল হোক পরশু হোক একসময় বললেই চলত। বাড়িতে কেন বললাম না জানিস ? কথা শুনে তুই রেগে গিয়ে চেঁচামেচি জুড়বি, না মারতে উঠবি, জানা তো নেই ! বাড়িতে জানাজানি হয়ে যাবে। তুই ধরে নিবি বড়দা শত্রুতা করেছে। দোকানে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললে রেগে চেঁচামেচি করতে পারবি না, কেউ জানবেও না কী ছেলেমানুষি করছিস। আমিও আর কথাটি কইব না। নিজে বুঝেশুনে তোর যা খুশি করবি—আমাকে জড়াতে পারবি না, দায়ি করতে পারবি না।

গোবিন্দের মুখ এবার রীতিমতো বিবর্ণ দেখা যায় ! যতই ছোটোখাটো হোক দোকানের অবস্থানটি ভালো। বোধ হয় সেই জন্যই এতদিন চলে এসেছে। এতটুকু একটা ঘরের জন্য এত মোটা ভাড়া গুনেও।

বিকালবেলা। পথের দুপাশে গিজগিজ করছে চলমান মানুষ, ফুটপাতে এটা ওটা বিক্রির জন্য সাজিয়ে নিয়ে, আর জুতো মেরামত জুতো পালিশ করে দিতে চেয়ে, অনেকগুলি ছোটোবড়ো মানুষ অস্থায়ী অনিশ্চিত জীবিকা অর্জনের লড়াই চালাচ্ছে।

রাগের মাথায় গুরুজন বলে গণ্য না করে বিশ্রী গাল পর্যন্ত কতবার গোবিন্দ তাকে দিয়েছে। আজ সে কথা কয় না। ভয়ে চুপ করে থাকে তার কথা শুনবার জন্য !

নন্দন গম্ভীর হয়ে আসল কথা বলে, আমি ভুবন বিপিনদেব কথা বলছিলাম। খুঁটিনাটি জানি না, তবে মোটামুটি তোমার প্ল্যানটা আঁচ করেছি। একটু বেশি রকম সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটিয়েই তুমি প্ল্যানটা করেছ। তুমি বোকা নও, তুমি জানো যে ওদের ব্যাবসাই হচ্ছে চোরামি—তার একটা দিক হচ্ছে তোমার মতো ছেলেমানুষদের ঘাড় ভাঙা। ওরা কেমন লোক, তুমি তা ভালো রকম জানো। তুমি প্ল্যান করেছ ভালো। ওরা তোমার ঘাড় ভাঙতে চায়, তুমি ওদের কৌশল উলটে দিয়ে নিজের কাজ বাগিয়ে নেবে।

গোবিন্দ অভিভূত হয়ে বলে, ভাবী আশ্চর্য তো, কেউ যা বোঝেনি, তুমি তা বুঝে গিয়েছ ! ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা। ওরা ভাবছে, আমি ছেলেমানুষ, আমাকে সহজেই ফিনিস কবতে পারবে। ভুবন আর বিপিন শালাকে কাত করে যদি না আমি উঠতে পারি তো—

থাম।—চেঁচাস না।

গোবিন্দ মাথা হেঁট করে।

নন্দন চারিদিকে একবাব চোখ বুলিয়ে আনে। দিনান্ত যত ঘনিয়ে আসছে তত বাড়ছে শহরের পথে গাদাগাদি করা ভিড়। কারখানায় আপিসে যারা আটক ছিল সকাল থেকে, জীবনের জন্য জীবনান্তক শ্রম করে তারা এবার বেরিয়ে আসছে।

তার ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়ে তার কথা শোনার জন্য গোবিন্দ অপেক্ষা করে আছে।

মনে মনে নরেনের হাসি পায়। তাকে কথায় কথায় ধমকানো ছিল যার অভ্যাস, ধমক খেয়ে তার এতটুকু রাগ হয়নি ! তারই স্বার্থঘটিত ব্যাপার কিনা !

আজ সকালেই নরেনকে সে বলেছিল, বাড়ির সকলে এতদিন যে ব্যবহার করে এসেছে তার সঙ্গে, এবার তার প্রতিকার করবে, প্রতিশোধ নেবে।

এই কী তার নমুনা ?

গোবিন্দের ছেলেমানুষি মতলব বুঝে তার বিপদ টের পেয়েই ছুটে এসেছে তাকে সাবধান করে দিতে, মাধব আর বিপিনের কবল থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে।

কাঁচাবুদ্ধি নিয়ে ঝানু ভুবন আর বিপিনের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে কাত হয়তো হোক না গোবিন্দ ? তার কী এসে যায়? কিন্তু চুপচাপ থাকা গেল না কিছুতেই ! ছোটোলোকের চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়ে মানুষ হয়েছে কিন্তু ছোটোলোক হবার সাধ্য বোধ হয় তার নেই।

শোন বলি তোকে। বোকামি করিস না, একেবারে ডুবে যাবি। তুই গিয়েছিস ওই দুটো ঘুঘুর সঙ্গে চালাকির পাল্লা দিতে ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর। দাদুকে সব জানিয়ে দে—দাদু সামলে দেবে।

দোকানটা বাড়াব ভাবছি যে ? দাদুর সেই সেকেলে এক রকম দোকান চালানো—

তাই চলুক না কিছুদিন ? দোকানটা টিকে থাক, তোর বয়স বাড়ুক, জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা জন্মাক ? দু-চারবছর পরেই নয় দোকানটা বাড়াবি ?

গোবিন্দ গোমড়া মুখে বলে, দেখি ভেবে। তুমি কিন্তু দাদুকে কিছু বোলো না।

আমার গরজ পড়েছে বলতে।

কাছেই চায়ের দোকান, পথের ও পাশে। গোবিন্দ বলে, চা খাবে ?

না।

নন্দন আর দাঁড়ায় না।

৩

মণ্টু ঘনঘন তার কাছে আসে।

সে মাঝে মাঝে মাধবের কাছে যায় বিদ্যার জাবর কাটতে।

মণ্টু তার কাছে ঘনঘন আসে সগৌরবে পরীক্ষা পাসের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার উপায় সম্পর্কে উপদেশ চাইতে, পরামর্শ করতে।

পাস করা। প্রথম হয়ে, সেরা হয়ে পরীক্ষায় পাস করা। এ ছাড়া মণ্টুর কোনো চিন্তা নেই, কামনা নেই। উচ্চাশাও তার নেই।

সারাবাংলার যত ছেলে আগামীবার স্কুলান্তক পরীক্ষা দেবে তাদের সকলকে হারিয়ে সবার উপরে সে হতে চায় না। এতদিন যেটুকু তার কৃতিত্ব ছিল তার স্কুলের তার ক্লাসের শখানেক ছেলের চেয়ে এগিয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল—সেইটুকুই সে ফিরে পেতে চায়, বজায় রাখতে চায়।

শুধু এই স্কুলে ফার্স্ট হয়ে পাস করে কী করবি মণ্টু ?

ফার্স্ট হব, আবার কী ?

বড়ো হবে। সকলে প্রশংসা করবে। দীননাথ আনন্দে কেঁদে ফেলবে। বড়ো চাকরি পাবে। মা-বাবা ভাইবোনদের সুখে আরামে রাখবে। বিয়ে করে টুকটুকে বউ ঘরে আনবে। দশজন মানী লোকের মধ্যে সম্মানের আসন পাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি কামনাগুলি সত্যই অস্পষ্ট মণ্টুর মনে।

অতসব সে বোঝে না। তার যেন শুধু জিদ যে সে বরাবর এই স্কুলে ফার্স্ট ছিল এবারও ফার্স্ট হয়ে পরীক্ষা পাস করবে।

নিছক একগুঁয়েমি।

পাস না করে বড়ো হওয়া যায় না ? কত মানুষ পরীক্ষায় কাত হয়েও জীবনে কত বড়ো হয়েছেন।

মণ্টু এ সব কথার ধাঁধা জানে।

সে তো আলাদা কথা। সবার কী সব ক্ষমতা থাকে ? আপনি চাইলেই পঙ্কজবাবুর মতো গান গাইতে পারবেন, মানকরের মতো ক্রিকেট খেলতে পারবেন ? যেটা যার ধাতে থাকে। আমার পড়ার দিকে ঝোঁক আমি পড়ব।

নরেন টের পায়, উপায় ও পরামর্শ চেয়ে মণ্টু কেবল তার কাছেই আসে না এবং মণ্টুর পরীক্ষা পাসের সমস্যা একমাত্র তাকেই শুধু বিচলিত করেনি।

পাড়ার প্রৌঢ় উকিল বিনোদ যেচে তাকে পড়িয়ে ফার্স্ট করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে শুনে সে আশ্চর্য হয় না।

বিনোদও স্কুলে ফার্স্ট হত। খুবলে খুবলে প্রায় সব বিষয়ে বিদ্যাচর্চার একটা ঝোঁক আজও বজায় আছে, সাহিত্যচর্চার চেষ্টা পর্যন্ত মাঝে মাঝে চলে। বোধ হয় এই জন্যই ওকালতিতে তেমন পশার জমেনি, কোনো রকমে চলে যায়।

নরেনকে সে বলে, তুমি নাকি মণ্টুকে বলেছ ভালো কোচিং ছাড়া ফার্স্ট হওয়া যায় না ? খুব খাঁটি কথা। কিন্তু সমীরের মাস্টার তো ভালো পড়ায় ?

কিন্তু পড়ায় তো সমীরকে—সমীরের স্ট্যান্ডার্ডে ফার্স্ট যে হবে তাকে ফার্স্ট করার জন্য পড়াতে হবে।

আমিই পড়াব ভাবছি। দেখি যদি উতরে দিতে পারি। মনে হয় ছেলেটার ফিউচাব আছে।

পারবেন ?

এককালের ভালো ছাত্র এম এ, বি এল, বিনোদ আহত হয়ে বলে, একটা স্কুলের ছেলেকে পড়াতে পারব না ?

সে রকম পারার কথা বলিনি। একটা ছেলেকে ভালো করে পড়ানো তো কম ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয় !

ক-টা মাস চালিয়ে দেব।

নরেন মনে মনে ভাবে, ক-টা মাস নয়, চালিয়ে দিলেন, মণ্টু উতরে গেল, কিন্তু তারপর কে চালাবে ? মুখে সে আর কিছুই বলে না।

বিনোদ খুব উৎসাহ করে মণ্টুকে পড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু দুচারদিনেই টের পাওয়া যায় যে নরেনের আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়, এককালের ভালো ছাত্র হলেও তাব দ্বারা এ কাজ হবে না।

এমনিতেই অবশ্য তার অকাজের সীমা নেই। যেচে যেচে পাঁচজনের দায় ঘাড়ে নিয়ে আর পরের উপর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই তাব দিন যায়।

কিন্তু দেখা যায় মণ্টুকে পড়াতে না পারার কারণ মোটেই সেটা নয়। সকালে বিকালে একঘণ্টা করে পড়াবার সময় সে করে নেয় কিন্তু পড়াতে গিয়ে টের পায়, ছেলে পড়ানোটা একেবারেই তার ধাতে নেই।

মণ্টুকে পড়াতে হলে তাকে বেশ কিছুদিন খেটেখুটে ছেলে পড়ানো শিখতে হবে। এ তো বিদ্যা বা জ্ঞানলাভ নয়—কতগুলি বই পড়ে ছেলেদের পরীক্ষা পাস করার উদ্ভট ব্যবস্থা। বই পড়ানো আর পরীক্ষা সবই যেন একেবারে উদ্ভট আর জটিল এক জগাখিচুড়ি ব্যাপার।

সেই কবে এককালে স্কুলে এ সব পড়েছিল, এতকাল পরে কি কিছু মনে থাকে ? কত কিছু অদলবদলও হয়ে গেছে।

না বাবা, আমার দ্বারা হল না।

তবে বিনোদ জেদি মানুষ। নিজে পড়াতে না পারলেও মণ্টুর জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয় সে করে দিত।

হঠাৎ সে চলে গেল জেলে।

শহরে সেদিন হরতাল হবে। বিনোদ রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। কিন্তু হরতালটা ডাকা হয়েছিল ভাতকাপড়ের দাবিতে। চাবিদিকে ভাতকাপড়ের অভাবে মানুষ কীরকম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ভালো করেই সেটা তার নজরে পড়ছিল।

হরতালের খবর শুনেই বলল, হাঁ হাঁ, হরতাল হওয়া উচিত। মানুষ না খেয়ে মরবে নাকি ? ন্যাংটো হয়ে থাকবে ?

চারিদিকে গাঁ থেকে দলে দলে চাষিবা এসে শহরে জমে, শোভাযাত্রা করে শহরের রাজপথে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে বিনোদ একেবারে সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় শোভাযাত্রার।

তারপর হয় পুলিশের হামলা। হাঙ্গামা হয় জবর। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আহত হয়ে বিনোদ জেলে চলে যায়।

মাস কয়েক পরে টেস্ট। তারপর আসল পরীক্ষা। আশা কি ব্যর্থ হবে মণ্টুর ? দীননাথের ? স্কুলের কর্তৃপক্ষের ? এতকাল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসে আসল পরীক্ষায় শুধু ভালোভাবে পাস করাই সার হবে, অসাধারণ কিছু করতে পারবে না ?

কেবলমাত্র এই ক-টা মাস নিয়মমতো একজনের কাছে প্রাইভেট পড়ার সুযোগটুকুর অভাবে ?

দীননাথ বলে, আমার যদি টাকা থাকত রে মণ্টু—!

সকালে কাজে বেরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত দীননাথ কাতরভাবে বারবার অধ্যয়নরত ছেলের দিকে তাকায়। রাত জেগে পড়েছে, আবার অন্ধকার থাকতে উঠে পড়তে বসেছে। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে বসে পড়েই ছেলে তার দেখিয়ে দিতে পারত পরীক্ষায় পাস করা কাকে বলে।

একজন মাস্টারের অভাবে সে কাবু হয়ে যাবে। প্রথম দু-চারজনের মধ্যে যার ঠাঁই পাওয়া সম্ভব, স্কুলের মাস্টাররা পর্যন্ত যেটা আশা করে, সে ছেলে শুধু ভালোভাবে পাস করতে পারবে !

চোখ ফেটে জল আসতে চায় দীননাথের। বুকের মধ্যে জ্বালা করে।

সে এক রকম কিছুই করেনি ছেলের জন্য। শুধু এত বড়ো ছেলে থাকতেও সংসারের ছোটো বড়ো কোনো ঝঞ্ঝাটে তাকে না জড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা কবার সুযোগটা দিয়েছে। ছেলের নিজেব গুণেই ব্যবস্থা হয়েছে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাবার। তার যদি ক্ষমতা থাকত ক-মাসের জন্য একজন মাস্টার রেখে দেবার ! এইটুকু যদি সে করতে পারত ছেলের জন্য !

হ্যাঁরে, কত লাগে একজন মাস্টার রাখতে ?

সে অনেক লাগে। ভালো মাস্টার হলে পঁচিশ তিরিশ টাকার কম নয়।

ও বাবা !

শিক্ষকদের সহানুভূতি আছে। ক্লাসে আর কোচিং ক্লাসে তার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। বাইরেও প্রশ্ন করলে সযত্নে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিনা পয়সার তাকে নিয়মিত পড়াবার সাধ্য তাদের নেই। দুবেলা ছেলে পড়িয়েও তাদের পেট চলতে চায় না।

খানিক পরে আবার আপশোশ করে দীননাথ বলে, তোর পড়াশোনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না আমি।

তুমি যে এত কষ্ট করছ ?

হা ! কষ্ট ওমনিও করতাম, এমনিও করছি। তোর জন্য করলাম কচুপোড়া।

দীননাথের মুখে বেদনার সঙ্গে একটু বিহ্বলতার ছাপ। দেখে বড়োই কষ্ট হয় মণ্টুর। মানুষটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে খাটে, তার উপরে আবার একলা ঘর সংসারের সব দায় মেটায়।

সে সংসারের খুঁটিনাটি দায় বইতে চাইলেই দারুণ অখুশি হয়ে বলে, ছিছি নিজের দায় বুঝিসনে তুই ? কী বলব তোকে ! তোর কাজ তুই করে যা দিকি নিজের মনে। মস্ত বিদ্বান হবি, কেউকেটা লোক হবি নাম-যশ পাবি—মোকে তখন মোটর চাপাস। তোর খুচখাচ ব্যাপারে নজর দেয়া কেন ? দুবার সওদা এনে দিয়ে তুই রাজা করবি মোকে ?

কীরকম হয়ে গেছে মুখটা তার বাবার ? কেমন একটা শুকনো রুক্ষ ম্যাজমেজে ভাব !

মণ্টু জোর দিয়ে বলে, তুমি এত ভাবছ কেন ? ফার্স্ট সেকেন্ড না হই, অনেক ছেলেদের তো টেক্কা দিয়ে যাব। আর পরীক্ষা নেই ? সেগুলোতে দেখা যাবে।

কী আশা ! প্রথম আসল পরীক্ষা সামনে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কতগুলি পরীক্ষার কথা ভাবছে মণ্টু।

অবশ্য তা না ভাবলে প্রথম আসল পরীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না।

দীননাথ কিন্তু তার কথায় ভরসা পায় না।

থার্ড হয়ে যাচ্ছিস যে !

হলাম বা ? একবার হলে কী হয় ?

দীননাথ সারাদিন দোকানে খেটে বেঁচে আছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে বউ আর ছেলেমেয়েকে। সে কী ছেলেমানুষের এই মন ভুলানো কথায় ভোলে ? কিন্তু কিছুই তো করার নেই তার, মুখে বেশি আপশোশ করে ছেলেটাকে অনর্থক বিব্রত করে আর লাভ কী হবে ?

তাই চিরদিন যেমন হাসিমুখে স্নেহ মেশানো দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে এসেছে তেমনইভাবে তাকাবার চেষ্টা করতে করতে বলে, তুই যদি বলিস তবে আর কথা কী !

পথে বেরিয়ে নরেনের সামনে পড়ে সেদিন সে কেঁদে ফেলে।

কিছুদিন ধরে মনের মধ্যে যে কথাটা নরেন নাড়াচাড়া করছিল দীননাথের কান্নার আঘাতে এক মুহূর্তে সেটা সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে যায়।

নরেন বলে, ভেবো না, আমি তোমার ছেলেকে পড়াব। পারব কিনা জানি না, চেষ্টা করে দেখব।

দীননাথ কথা বলতে পাবে না, তার হাত চেপে ধরে আবার কেঁদে ফেলে।

নরেন সোজা সরু গলির ভিতরে ঢুকে পড়ে। মণ্টুর পাশে ছেঁড়া মাদুরে বসে বলে, আমি তোকে পড়াব মণ্টু।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে মণ্টু শুধু চেয়ে থাকে।

এইখানে এসে পড়াব—দুবেলা। তোর যেতে হবে না। এখানে বসে পড়া অভ্যাস, এখানেই পড়ায় বেশি মন বসবে।

খবর জেনে নরেনের বাড়ির লোক বড়োই অসন্তুষ্ট হয়।

তারিণী বলে, তুমি নিজের ভাইকে নিয়ে পাঁচ মিনিট বসার সময় পাও না, পরের ছেলেকে বিনা পয়সায় দুবেলা পড়াচ্ছ !

বরেনকে পড়িয়ে কী হবে ?

কী হবে মানে ? ওর মাথা নেই, ওকেই তো ভালো করে পড়ানো দরকার। নইলে ফেল হয়ে যাবে তো।

তোমবা যা পড়াচ্ছ তার বেশি ওর দরকার হয় না। হাজার বেশি পড়লেও ওটুকুর বেশি ওর মাথায় ঢুকবে না।

মা বলে, পরের ছেলের জন্য ওর যত মাথাব্যথা। নিজের ভাই ফেল করলে বয়ে গেল।

তারিণী আরও গম্ভীর হয়ে বলে, কী যে সব খাপছাড়া কাণ্ড তোমার কিছুই বুঝিনে। ভবেশবাবু ছেলেমেয়ের জন্য একজন মাস্টার খুঁজছেন, ওদের পড়ালে তো ঘরে ক-টা টাকা আসত ? তার বদলে তুমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ। এদিকে অভাবের অন্ত নেই।

নরেন বলে, আপনারা বুঝছেন না কথাটা। মানুষের খেয়ালখুশি থাকবে না, কোনো শখ থাকবে না ? ওকে যে আমি পড়াচ্ছি, এটা আমার কাছে সিনেমা দেখা, খেলাধূলা করার মতো ওকে পড়িয়ে আমি আনন্দ পাই। একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ ?

শুনে মা-বাবা নির্বাক হয়ে যায়।

ঊষা বলে, বিয়ে করতে বলছি সবাই—

তার কথা কানে না তুলে নরেন আবার বলে, ওকে না পড়িয়ে আমি যদি সকাল সন্ধ্যা তাস পাশা খেলে কাটাতাম, তোমরা কিছু বলতে ? সেই সময়টা আমি অন্য একটা খেয়াল মেটাতে চেষ্টা করছি !

সোজা খাটুনি একটা ছেলেকে স্কুলান্তক পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার জন্য তৈরি করতে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া !

ছেলে পড়ানো অভ্যাস ছিল না—তবে নিজে স্কুল ডিঙিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়েছে অল্পদিন আগে। পড়া আর পড়ার খুঁটিনাটি কায়দাকানুন বিনোদের মতো ইতিমধ্যে সব ভুলে যায়নি।

কিন্তু মণ্টুকে পড়াতে পড়াতে বারবার তার উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে, দেহমনে রীতিমতো ক্লান্তি বোধ হয়।

চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে মণ্টুর এই পরীক্ষা পাসের কৃতিত্বের নিষ্ফল ভবিষ্যৎ। বৃত্তি পেলেও, পড়া চালিয়ে যেতে পারলেও বিশেষ কিছু সে আর করতে পারবে না এই লাইনে।

গরিবের ছেলে কি পাসের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে না? সে রকম দৃষ্টান্ত কি নেই ?

আছে বইকী !

তারা অসাধারণ। মণ্টুর মতো সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে না।

মণ্টুর সে গুণ নেই। সে নরম। তার বড়ো হবার স্বপ্ন শুধু মা-বাবা ভাইবোনদের কষ্ট দূর করা।

ঘেরা রোয়াকটুকুতে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মণ্টুর মা রান্না করে আর থেকে থেকে মুখ তুলে তাদের দিকে তাকায়। বিষণ্ণ শুকনো মুখে মালতী ঘরের কাজ করে যায়।

মালতীকে দেখে মনে হয় তার বোধ হয় কোনো অসুখ আছে।

ছোটো ছেলেমেয়ে ক-টা বাইরে কোথায় খেলছে। মাঝখানে একবার বাড়ি এসেছিল, মালতীর ধমকে আবার পালিয়ে গেছে। মণ্টুর পড়ার সময় তাদের বাড়িতে খেলা করা বারণ।

বাড়ির মধ্যে রোজ দু-তিনঘণ্টা এভাবে বসে থাকার ফলে আপনা থেকেই এই অশিক্ষিত গরিব পরিবারটির চালচলন নজরে পড়ে নরেনের। কতকালের পুরনো কত অন্ধকার যে জমাট বেঁধে আছে এদের চেতনায়! কত সংস্কার, কত অন্ধবিশ্বাস কত ভীরুতা !

কিন্তু সমালোচনা জাগে না নরেনের মনে।

তাদের শিক্ষিত পরিবারে মানুষগুলির চেতনা তো মুক্ত নয় এ সব সংস্কার, বিশ্বাস আর ভীরুতা থেকে !

কতগুলি কেবল তলিয়ে গেছে মনের তলায়, কতগুলির ঘটেছে রূপান্তর। মিলিয়ে যায়নি, শেষ হয়ে যায়নি—নূতন ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি সেগুলির স্থান দখল করে।

তবে অন্যায় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জন্মেছে প্রচণ্ড। যেমন তাদের শিক্ষিত পরিবারের মানুষগুলোর মনে, ঠিক তেমনই এই বাড়ির অশিক্ষিত মানুষগুলির মনেও।

একদিন এই বিক্ষোভ চেতনার সংস্কার ও ভীরুতার নাগপাশের বাঁধন ছিন্নভিন্ন করে দেবে বইকী !

একটি অন্ধবিশ্বাসে আশ্চর্য মিল তাদের শিক্ষিত এবং এদের শিক্ষায় বঞ্চিত পরিবারে। এরা যেমন অন্ধের মতো বিশ্বাস করে যে পরীক্ষা পাস করলেই রাজা হওয়া যায় তাদের বাড়ির মানুষেরাও ঠিক তেমনিভাবে এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে।

বরেনের বেলাতে পর্যন্ত তাই অসাধ্য সাধনের এত চেষ্টা !

চারিদিকে কত পাস করা বেকারের দুর্গতির অন্ত নেই, সে সব চোখে দেখেও ভুল ভাঙে না।

লাখ লাখ পাস করা আর মূর্খ মানুষের জন্য চাকরি আর কাজের কোনো ব্যবস্থাই নেই—জেনেও খেয়াল হয় না যে চাকরি আর কাজের ব্যবস্থা না হলে শুধু পাসের লড়াই চালিয়ে যাওয়া বোকামি।

এত দুর্ভোগের পরেও নন্দনের পর্যন্ত চেতনা হয়নি যে পাস কবা আর চাকরি পাবার আসল ব্যাপারটা কী !

কিন্তু সে ও কি বুঝে ফেলেছে এ গলদের শিকড় কোথায়? তার চেতনা থেকে কি সাফ হয়ে গিয়েছে এই অন্ধবিশ্বাসের জঞ্জাল ?

মাধবকে সে বলে, কিন্তু দোষটা কী, ভুলটা কোথায় ? দেশে শিক্ষাই কম, ভীষণ রকম কম। পাস করে চাকরি পাবার আশাতে হলেও। যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তার সুযোগ নিয়ে লেখাপড়া শেখা তো দোষের নয়। মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শ হোক, জীবিকার জন্যও তো শিক্ষা ?

মাধব বলে, অব্যবস্থার দুটো দিককে জড়িয়ে দিচ্ছেন। একদিকে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা নেই, অন্যদিকে সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা নেই।

নরেন মাথা নেড়ে বলে, ওদিক দিয়ে বলিনি কথাটা। লোকে জানছে যে হাজার হাজার ছেলের চাকরি হবে না—চাকরিই নেই। তবু এত টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেকে পড়ায় কেন? বরং পড়ার টাকাটা জমিয়ে দোকান দিলে—

মাধব হেসে বলে, সবাই দোকান দিলে কে কিনবে ?

একটু খোলসা করে বলুন।

মাধব সিগারেট ধরায়।

আপনি গোড়ার গলদটা ভুলে যাচ্ছেন—অনেক লোকের জীবিকা অর্জনের কোনো ব্যবস্থাই নেই। যে সিস্টেম চালু আছে তাতে এরা বাড়তি লোক, ফালতু লোক—এদের কাজ দিয়ে খাটালে প্রফিট বাড়বে না। এদের যে পরিমাণ বেতন দেওয়া হবে সেটা প্রফিট থেকে কাটা যাবে। একটা ছেড়ে আরেকটা ধরে তাই লাভ নেই, সেখানেও এক অবস্থা। সিস্টেমটা না পালটালে একটা মোট সংখ্যা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হতেই পারে না। তিন হাত চাদর দিয়ে কী চার হাত বিছানা ঢাকা যায় ? এদিক টানলে ওদিক—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মানসী বলে, ঠিক খাটো শাড়ির মতো। আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।

এটা তার খোঁচা। সত্যই তার পরনে সস্তা না হলেও খাটো একখানা শাড়ি। কেনার সময় মাধবের খেয়াল থাকেনি যে শাড়ি শুধু পছন্দ করে কিনলেই হয় না, ক-হাত শাড়ি সেটাও জিজ্ঞাসা করে কিনতে হয়।

খাটো শাড়িখানা বদলানো যায়নি।

মাধব ক্যাশমেমো হারিয়ে ফেলেছিল !

একটু চুপ করে থেকে মাধব বলে, তাছাড়া, আপনাদের আরেকটা ভুল ধারণা আছে। ভদ্রসমাজে শুধু চাকরির জন্য লেখাপড়া শেখে না। জীবিকাটা নিশ্চয় দরকার মানুষের, কিন্তু শুধু পেটে খেয়ে মানুষের চলে না। মানুষের একটু সংস্কৃতিও দরকাব।

নরেন বলতে যায়, সংস্কৃতি কী শুধু—

মাধব জোর দিয়ে বলে, না না, কেবল শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি দরকার, তা বলিনি। সমস্ত মানুষ বোঝাতেই আমি মানুষ কথাটা ব্যবহার করেছি। সব মানুষের সংস্কৃতি দরকার—চাষি মজুব থেকে সকলের।

মানসী প্রশ্ন করে, বুনো অসভ্য মানুষের ?

তাদেরও দরকাব—তাদেরও সংস্কৃতি আছে। তারা শুধু তুলনায় অসভ্য—ওই অবস্থাটাই এককালে মানুষের সব চেয়ে সভ্য অবস্থা ছিল। বুনো মানুষদেরও নিশ্চয় সংস্কৃতি আছে।

সংস্কৃতির মানে তাহলে দাঁড়াচ্ছে—

সংস্কৃতির মানে ছোটো করে ধরা হয়। প্রকৃতিকে জয় করে জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য যা কিছু করা দরকার যা কিছু থাকা দরকার সব কিছুই মানুষের সংস্কৃতি।

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়েছে খেয়াল করে নরেন বিস্ময় বোধ করে। মণ্টুর পরীক্ষা আর নন্দনের চাকরিব বাস্তব সমস্যা থেকে একেবারে মানবিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যায়।

কিন্তু যোগাযোগটা তো মিথ্যা নয় !

মণ্টুর আসল পরীক্ষার মাসখানেক বাকি ছিল।

সকালে তাকে পড়িয়ে যথাসময়ে আপিসে গিয়ে নরেন জানতে পারে, তার চাকরি নেই।

শুধু সে একা নয়, আরও তেরোজন চাকবি করে যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !

আঘাতটা পড়েছে তেরোজনের উপর। কিন্তু কেবল তাদেরই মনে হয়নি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের কথাটা, আপিসের আবও প্রায় সাড়ে চাবশোর মতো কেরানির অনেকেরই এই রকম মনে হযেছে।

নরেন বাড়ি ফেরার পর বাড়ির লোকের তো আর কোনো উপমা মনেই আসেনি।

খবরটা চেপে যাওয়ায় গোড়ার কয়েকদিন পাড়ার লোক জানতে পাবেনি—ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছে। নইলে তাদের মধ্যেও কতজন ব্যাপারটাকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মনে করেছে আন্দাজ করা যেত।

ধরাবাঁধা ধারণা দিয়ে উপমা দিয়ে, ব্যাপার বোঝার মানসিক অভ্যাস বেশ কিছুদিন থেকে কেটে যেতে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু আজও উপমা ছাড়া যেন ধাবণাশক্তিব উপায় নেই। কোনো রকম উপমা ছাড়াই সব ব্যাপার ঠিকমতো আঁচ করতে পারা মানেই তো জীবন ও চেতনায় বিপ্লব ঘটে যাওয়া !

মেঘ কী কম ঘনিয়েছে জীবনের আকাশে ! যৌবনেব দিনদুপুরে পর্যন্ত কী কম আঁধার ঘনিয়েছে। চোখে পড়তেও কি বাকি আছে ওই আকাশজোড়া ঘন কালো মেঘ ?

তবু চাকরি করতে করতে বিনা নোটিশে আচমকা ছাঁটাই হওয়াকে মনে হয় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !

মনটা কতদূর যন্ত্র দাঁড়িয়ে গেলে আকস্মিক বিপদ এ রকম যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া আনতে পারে !

কতকাল ধরে যন্ত্র বানাবার চেষ্টা চলে এসেছে তাদের মনকে !

কিন্তু কই, এই নিয়মে যন্ত্রের মতো শুধু হা-হুতাশ করে চলে না তো বাড়ির মানুষ আপনজনেরা !

হতাশায় মুষড়ে পড়ে শুধু তো কপাল চাপড়ায় না !

বিনা মেঘে বজ্রের আঘাতে কাবু হবার বদলে নামমাত্র খানিকটা হা-হুতাশ করে প্রতিবাদের শোরগোল তুলে দেয়।

তাকেই দায়ি করে, দোষী করে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটার জন্য !

এত বড়ো দুর্ভাগ্যের খবরটা বাড়িতে কী করে জানাবে ভেবেই নরেন কাবু হয়েছিল সব চেয়ে বেশি।

সকলের কত আশা, কত ভরসা, তার এই চাকরির উপর ! চাতকের মতো সকলে শুধু তার মাসকাবারি বেতনের এক পশলা বর্ষণটুকুর আশায় তাকিয়ে থেকে দিন গোনে না, কত আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে কল্পনারও মালা গাঁথে !

খেয়ে-দেয়ে যথাসময়ে যথারীতি চাকরি করতে বেরিয়েছে, ফিরে গিয়ে কোন মুখে সে ওদের জানাবে যে পরদিন থেকে নটায় তার ভাত দরকার হবে না, চাকরি করতে বেরোবার প্রয়োজন হবে না !

দেড়মাসের মাইনের টাকা এনেছে, সামনের মাস থেকে আর মাইনে আনবে না !

মা বাবা ভাই বোন কী বলবে কী করবে, কল্পনা করার চেষ্টা করেছে আর অন্ধকারে ভয়ের স্থানে ছেলেমানুষের আতঙ্কের মতোই সেদিন সে আতঙ্ক অনুভব করেছে বাড়ি ফিরতে !

রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারেনি।

চাকরি গেছে। কোথায় নিদারুণ হতাশায় একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে তার বদলে নিজের ভিতরকার একটা অস্থির উন্মাদনার তাড়ায় আর বাড়ির মানুষের ভয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে রাত দশটা পর্যন্ত !

পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে !

পকেটে একমাসের পাওনা আর বিনা নোটিশে তাড়ানোর জন্য আধমাসের ভিক্ষা দেওয়া মাইনের টাকাগুলো কিন্তু ট্রামে-বাসে পর্যন্ত সে ওঠেনি।

কয়েক আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য নয়।

ট্রামে-বাসে উঠে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বসবার কথা ভাবতেই তার মন বিগড়ে যাচ্ছিল।

দশটার পর বাড়ি ফিরে রাত্রে সে কিছু ফাঁস করেনি।

পরদিন সকালে জানিয়েছে।

কিন্তু বাড়ির লোক কী আর বলবে। কতই আর হা-হুতাশ করবে। কত সমবেদনা দেখাবে এই দুর্দিনের বেকারকে ?

তাই যেন ওদিকেই কেউ যায় না। আঘাতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর হতাশায় কিছুটা মুখ কালো করে সকলে কিছুক্ষণ ব্যাজার হয়ে থেকে দোষারোপের শোরগোল তুলে দেয়।

দেশে বেকার অনেক কিন্তু চাকরিও তো করছে অনেক লোক। এই পাড়ারই অনেক পাস করা ছেলে ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে চাকরির জন্য—কিন্তু চাকরিও কী পাচ্ছে না বা করছেও না একজনও ?

রোজগেরে চাকরে মানুষের দলে ভিড়েও, এতদিন চাকরি করেও, তুই শেষে এমনভাবে বেকারের দলে এসে ভিড়লি! সব দোষ তোর। মানিয়ে চলতে পারলে কী তোর এ দশা হয় ? চাকরি যায় ?

চিরকালের অবুঝ একগুঁয়ে সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধিহীন ছেলে। এ ছাড়া তার কী গতি হবে ?

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়। তাকেই শেষ পর্যন্ত দোষী ঠাউরে নিল বাড়ির মানুষ ? এত ছেলের সঙ্গে বরেনের ফেল করার অপরাধের মতো তারই ঘাড়ে চাপল চাকরি খোয়ানোর দায় ? সেই হল অপরাধী ?

বাড়ির লোকে খুশি হবে না এটা তার জানাই ছিল। কিন্তু তার উপরে এতখানি বিরূপ হবে, সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে এমন বিশ্রী ব্যবহার শুরু করবে তার সঙ্গে, এটা সে ভাবতেও পারেনি।

পাস-টাস করে প্রায় এক বছর কাজের চেষ্টার বেকারির সময় ক্রমে ক্রমে বেশি বেশি তিতো হয়ে উঠছিল সকলের ব্যবহার, দুবেলা রেশনের পচা দুর্গন্ধ চাল আর খারাপ গমের রুটিতে ভাগ বসাবার জন্য মা পর্যন্ত যেন তাকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছিল।

মামার চেষ্টায় একটা চাকরি পেয়ে সেটা হারিয়ে আবার বেকার হবার ক-টা দিনের মধ্যে সকলের কাছে সে যেন চোরছ্যাঁচড়ের চেয়ে অধম ঘরের শত্রু দাঁড়িয়ে গেছে !

শুধু অবজ্ঞা করা নয়, তাকে ভাত খেতে না ডেকে, নিজে গিয়ে আসন পেতে খেতে বসলে তাকে ভাত দিতে স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখিয়ে, তাকে যেন আঘাত করতে চায় মা আর বোনেরা !

এক সকালের মধ্যে এই পরিবর্তন।

চাকরি পেয়ে সেও হাঁফ ছেড়েছিল, আশা আনন্দের উন্মাদনায় রাতারাতি সকলের কাছে আদরের খাতিরের মানুষ হয়ে ওঠাটা তার নিজের কাছেও কিছুমাত্র খাপছাড়া ঠেকেনি।

চাকরি পাওয়ার আশা আনন্দের উত্তেজনা তারও কেটে গিয়েছিল বাড়ির লোকেরও কেটে গিয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যে—সে কিছু রোজগার করে সংসারে দেওয়ায় কয়েকটা মারাত্মক সমস্যার সমাধান হয়েছিল, পরিবারটির ভেঙে চুরমার হওয়া ঠেকানো গিয়েছিল—কিন্তু অভাব ঘোচেনি।

অনেক অভাব। যেন অন্ত নেই টানাটানির !

অভাব অনটনে পীড়িত মানুষের কি আনন্দ টেঁকে ?

এক বছরের জীবনপণ চেষ্টা অবশেষে মামার দয়ায় সার্থক হয়েছে, নরেন একটা চাকরি পেয়েছে, এটা দু-একদিনের জন্য আনন্দে পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু একঘেয়ে একটানা কষ্টকর বাঁচা ঠিক যেন নেশার সাময়িক বাঁকা আনন্দের মতোই শুষে নেয় এই খুশি হওয়ার রসটুকু।

তবু তার আদর আর খাতির বজায় ছিল।

তার আপিসের ভাত রাঁধতে হবে নটার মধ্যে, আপিস থেকে ফিরলেই সে যাতে মুখ হাত ধোয়ার জল পায়, চা আর জলখাবার পায়, সে ব্যবস্থা করতেই হবে—টুঁ শব্দটি না করে।

বেকার হবার পর অন্তত ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে তো কমা উচিত ছিল তার এই আদর আর খাতির ? এমন বেহায়ার মতো মা বোনেরা পর্যন্ত ক-দিনের মধ্যে আদর আর খাতিরের পাট তুলে দিয়ে বিরাগ দেখানো আর ঘা মারার পাট শুরু করল কী করে ?

অনেক ভেবেচিন্তে নরেন এক ধরনের একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে।

সে অবশ্য ভাবে তার এটা ভীষণ রকম বিদ্রোহ ঘোষণা, প্রায় বিপ্লব করে ফেলার কাছাকাছি।

কিন্তু আসলে এটা যে তার আত্মরক্ষার চেষ্টা— মেয়েলি মার্কা চেষ্টা—সেটা তার ধারণাতেও আসে না।

সে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

তাকে কেউ খেতে ডাকে না এই অজুহাতে।

তার জন্য রান্না হয়—সেও জানে যে রেশন আর এভাবে ওভাবে সংগ্রহ করা—পয়সা দিয়ে সংগ্রহ করা—খাদ্য অন্য সবার মতো তার জন্যও প্রস্তুত হয়েছে। কেউ বলেনি যে চাকরি গেছে বলেই সে খাবে না।

তবে অন্যদের ডেকে তাগিদ দিয়ে খাওয়ানো হয় ওই খাদ্য, তাকে কেউ খেতে ডাকে না।

সে তাই ঠিক করে না ডাকলে খেতে যাবে না।

সকালে চা-খাবার। দুপুরের ডালভাত। রাত্রের রুটি ছেঁচকি। কিছুই খেতে যাবে না—না ডাকলে।

তার এই বিদ্রোহে ফল হয়।

একেবারে অপ্রত্যাশিত ফল !

খেতে তাকে ডাকা হয়, কিন্তু এমনভাবেই ডাকা হয় যে অপমানে অভিমানে জ্বলে পুড়ে যায় তার হৃদয় মন।

বিদ্রোহ শুরু করার প্রথম দু-তিনটে দিন সকলের খাওয়া হবার পর বিরক্তভাবে গম্ভীরভাবে তাকে খেতে ডাকা হয়।

তারপরে শুরু হয় প্রতিক্রিয়া।

চা জলখাবার খেতে ডাকা হয় এইভাবে : কী আরম্ভ করেছ শুনি? খাবার আগলে বসে থাকব নবাব সায়েবের জন্যে? ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে নামিয়ে চা গবম করে দিতে হবে বাবুকে ?

দুপুরে ঝাঁঝের সঙ্গে বলা হয় : পিত্তি গিলবি না ? ক-টা রাঁধুনি বামনি ঝি চাকর রেখেছিস যে হেঁসেল আগলে বসিয়ে রাখিস ?

কথাটা বলে মা।

উষা সেই সঙ্গে ফোঁড়ন কাটে, তোমার সত্যি বিবেচনা নেই দাদা, বড্ড তুমি স্বার্থপর। নিজের আরাম আয়েসটা বড্ড বেশি বোঝ।

আমি খাব না।

কথাটা বললেই হত সময়মতো? এক পয়সা রোজগার নেই, রাগ আছে দারোগার মতো।

না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে বাইরে যে অপমান জোটে, তা যেন তুচ্ছ হয়ে যায় বাড়ির মানুষের গায়ের জ্বালায় পরিবেশন করা এই সব ঘরোয়া অপমানের কাছে।

নন্দনের বোধ হয় এ রকম অপমান জোটে না। সে তো চাকরি পেয়ে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়নি।

তবে বিষে খানিকটা বিষক্ষয়ও হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই সে টের পায়, মা আর উষার মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে কী কুৎসিতভাবেই পরস্পরকে আক্রমণ করছে তার মা আর বোন ! কী রকম বিশ্রীভাবে বিগড়ে গেছে দুজনের মেজাজ।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে নরেন তাদের গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করার কথাগুলি শোনে।

থেকে থেকে তারিণীর গর্জন করা ব্যর্থ ধমক শোনে।

হঠাৎ সশব্দে একটা চড় পড়ে উষার গালে।

উষা সশব্দে কেঁদে ওঠে।

আঠারো বছরের মেয়ে !

মা-র হাতে গালে চড় খেয়ে তাকে কাঁদতে হয়।

নিজের মনে নিরিবিলি একটু বসবার জায়গা নেই বাড়িতে।

বাড়িতে মানে তাদের ভাড়া করা বাড়ির দুখানা ঘরেব অংশটুকুতে।

বিনয়বাবুর বাড়ির সামনের রোযাকটুকুতে বসে বিত্ত সমস্যা নিয়ে তর্কের আসর জমিয়েছে পাড়ার মাঝবয়সি দশ-বারোজন চাকুরে।

জানালায় বসে বিড়ি টানতে টানতে নরেন ওদেব তর্ক শোনে—বাড়ির মানুষের কথাবার্তা শোনে।

তর্ক শুনে মনে হয় সকালবেলা খবরের কাগজে যা পড়েছিল সম্পাদকীয় এবং সংবাদ তারই মুখস্থ কবা পুনরাবৃত্তি নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

বাড়ির মানুষেব কথাবার্তা শুনে মনে হয় এইমাত্র মায়ে-ঝিযে যে ঝগড়া হয়ে গেল প্রাণের জ্বালায় তারই জের টেনে চলেছে মা-বাবা ভাইবোনেরা নানাছুতোয়, নানাঅজুহাতে।

রাত্রে আর তাকে খেতে ডাকতে হয় না।

নরেন যথাসময়ে গিযে ছেঁড়া চটের আসন টেনে নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে খেতে বসে যায়।

তারিণী জিজ্ঞাসা করে, কিছু সুবিধা হল ?

না।

আর কী হয় ! কুমুদ কত চেষ্টায় চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিল। পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম শুধু, নইলে কী আর এত ধরাধরি করে জুটিয়ে দিত ? সেই চাকরি তুমি খুইয়ে বসলে।

আবও তেরোজনকে ছাঁটাই করেছে।

তেরোজনকে করুক, তেরোশো জনকে করুক। তুমি কেন চাকরি পেয়ে রাখতে পারবে না, চাকরি খোয়াবে ?

ইচ্ছে করে খোয়াইনি।

ইচ্ছে করলে রাখতে পারতে। আমি তো শুনেছি সব। বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে। একবার ভাবলে না চাকরি ছাড়া তোমাব গতি নেই। ঝোঁকের মাথায় অবুঝের মতো না হয় করেই বসেছিলে বোকামি—ক-মাস যে চুপ করে ছিল ওপরওলারা তার মধ্যে সায়েবের কাছে গিয়ে ঘাট মানতে পারলে না ? তাহলে কী তোমার চাকরি যায় !

এত খিদে পেটে তবু সেঁকা রুটি পাতলা ডাল তিতো লাগে !

সবাই স্ট্রাইক করল—

মিছে কথা বোলো না। সবাই স্ট্রাইক কবলে সব্বায়ের চাকরি যেত। বেছে বেছে তোমাকে খেদালে কেন ?

আরও তেরোজনকে খেদিয়েছে।

খেদাক। তোমাকে খেদাল কেন ? তুমি নিশ্চয় বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে ?

নরেন নীরবে খেয়ে যায়।

সংসারে অবিরাম যে কামড়াকামড়ি চলেছে, বিশ্রী কুৎসিত কলহ চালিয়ে যেতে যেতে খানিক আগে তার মা আঠারো বছরের মেয়ের গালে যে চড় কষিয়েছে—এটাও সেই ঝগড়া, এ রকম অথবা ও রকম।

কতভাবে কত কিছুর জের টেনে টেনে এবং নতুন অজুহাত আঁকড়ে ধরে যে, অভাবগ্রস্ত নিরুপায় মানুষ আত্মকলহ সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা হারিয়ে গেছে বলেই যেন কারণে অকারণে মারামারি কামড়াকামড়ি করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা বর্তমানকে তিতো করে বিষাক্ত করে বর্জন করে ফেলার ঝোঁক চাপে !

মানুষের মতো বাঁচার অধিকার যারা হরণ করেছে তাদের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার সুযোগ না পেয়েই যেন আপনজনদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে জ্বালা জুড়োবার চেষ্টার অন্ত নেই।

নরেনও বেকার হয়ে সমান হয়েছে। দুজনে মিলে পয়সা রোজগারের একটা উপায় বার করার জন্য পরামর্শ করতে নরেনের বাড়িতে গিয়ে নন্দন পড়ে প্রচণ্ড একটা কলহের মধ্যে !

টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে এ বাড়ির মানুষের নগ্ন কুৎসিত একটা সংঘাতের মধ্যে।

উষার বড়ো বোন সন্ধ্যার বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে।

অশোককে জামাই করা হয়েছিল এই শর্তে যে তার এম এ আর আইন পড়ার খরচটা তারিণী জোগাবে।

এ জন্য নগদ টাকা তারা নিয়েছিল সামান্যই।

এম এ আর আইন পড়ার কী সহজ খরচ ! নগদ নিলে যা পাবে, পড়ার খরচের ভারটা শ্বশুরের ঘাড়ে চাপালে লাভ থাকবে তার অনেক বেশি।

কোনো এক আত্মীয়ের উদারতায় ঝপ করে একটা চাকরি জুটে যাওয়ায় অশোক আর পড়েনি। পড়ার খরচ দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারিণীর কাছে দাবি করা হয়েছিল নগদ টাকা। এই নিয়ে সন্ধ্যার বিয়ের এক বছরের মধ্যে কলহ বেঁধেছিল।

দুই পক্ষে কিছু রাগারাগির পর মেয়ের মুখ চেয়ে তারিণী নগদ যত টাকা দাবি করা হয়েছিল তার অর্ধেকের মতো দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিল।

অপর পক্ষ সন্তুষ্ট হয়নি, তবে একেবারে কিছু না পাওযার চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই লাভ— এই নীতি অনুসারে আপস ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিল।

বোনের বিয়ের টাকার জন্য ঠেকে গিয়ে বিপদে পড়ে এতদিন পবে অশোক আবার এসেছে তার নিজের বিয়েতে প্রাপ্য টাকার ছেড়ে দেওয়া অংশটা আদায় করে নিতে।

জোর দিয়ে সে বলছে, টাকা নাকি সে ছেড়ে দেয়নি, আপস করেনি। তারিণীব একলার চাকরিতে সংসার চলছিল, টাকাপয়সা হাতে ছিল না, তাই তখন তারিণী যা দিয়েছিল তাই নিয়ে বাকিটা তার কাছেই গচ্ছিত হিসাবে রেখেছিল, পরে একসময় নেবে।

শ্বশুরকে খাতির করেই নাকি সে এতদিন তাগিদ দেয়নি, চুপ করেছিল। টাকাটা জমা আছে থাক, নিলেই তো খরচ হয়ে যাবে, জরুরি দরকার পড়লে তখন চেয়ে নিলেই হবে !

আজ তার দায়ের সময় টাকাটা না দিলে চলবে কেন ? বোনের জন্য অনেক চেষ্টায় চাকরে ছেলে পেয়েছে—একেবারে পাকা চাকরি। তারিণীর কাছে টাকা পাওনা থাকতে কয়েক শো টাকার জন্য এমন ভালো পাত্রের সঙ্গে বোনের বিয়েটা তার ফসকে যাবে ?

নন্দন বুঝতে পারে, সংঘাত শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কথা কাটাকাটির পর্ব সাঙ্গ হয়ে এখন কলহ উঠেছে চরমে।

নন্দন বাড়িতে পা দিয়েই শুনতে পায় অশোক চিৎকার করে বলছে, দেবেন না মানে ? বাপ-ব্যাটা দুজনে মিলে চাকরি করছেন—জামাইয়ের দেনাটা মিটিয়ে দিতে আপনাদের অসুবিধা কী ? নরেনবাবুর চাকরি তো গেছে এই সেদিন—অ্যাদ্দিন তো দুজনে রোজগার করে টাকা জমিয়েছেন। এ রকম অন্যায় তো চলতে পারে না ! ছোটোলোক ছাড়া কেউ তো এভাবে মেয়ে পার করে জামাইকে ফাঁকি দেয় না।

নরেন চিৎকার করে বলে, তুমি পড়লে না কেন ? পড়লে আমরা তোমার পড়ার খরচ দিতাম। তবু আমরা তোমায় পাঁচশো টাকা নগদ দিয়েছি। আবার নগদ টাকা তোমার কীসের পাওনা ?

পড়ার খরচ দেবেন বলে নগদ কম নেওয়া হয়নি ? নামমাত্র নেওয়া হয়নি ? হিসেব করুন না দুবছর এম এ পড়ার খরচ কত—ওটা আমার পাওনা টাকা। আমি একপয়সা বেশি চাই না।

এ কী সেই অশোক ? ঊষাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এলে যার হাসিখুশি শান্ত অমায়িক স্বভাবে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত ? বলত যে এমন জামাই অনেক ভাগ্যে জোটে ?

এমন ছোটোলোকের মতো যে ঝগড়া করছে কয়েক শো টাকা আদায় করার জন্য—যে টাকা কোনো হিসাবেই তার প্রাপ্য নয় ! বিয়ের আগে কথাবার্তা চলার সময় এ পক্ষ থেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে চাকুরে না হোক, কমপক্ষে ভালোভাবে এম এ, এম এসসি পাস করা ছেলে তারা খুঁজছে।

মেয়েকে আই এ পাস করানোর পর আর পড়াতে পারেনি বটে কিন্তু তারা শিক্ষিত জামাই চায় মেয়ের জন্য। কমপক্ষে এম এ পাস।

অশোক যদি এম এ পড়ে—তাদের খরচে পড়ে—তবেই তারা সন্ধ্যাকে তার হাতে দিতে রাজি হবে।

চাকরি পেয়ে গিয়ে আর না পড়ে সে যে চাকরি করছে এতে কেউ অসুখী নয়—কিন্তু পড়ার জন্যই যে টাকা তার পেছনে ঢালার কথা ছিল,না পড়েও সে টাকা সে দাবি করে কোন যুক্তিতে ?

সন্ধ্যা দাঁড়িয়েছিল তফাতে, একা। দুখানা ঘর আর বারান্দাটুকুর সংকীর্ণতায় এতগুলি মানুষ থাকলে যতটুকু তফাতে সরে দাঁড়ানো সম্ভব।

ঝগড়া চলছে এ ঘরের ভিতরে, দুয়ারের কাছে উবু হয়ে বসে আছে নরেনের মা আর ঊষা।

বারান্দার কোনায় সরে গিয়ে সবার দিকে পিছন ফিরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা যেন প্রাণহীনা নিশ্চল মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে নন্দন বলে, একটু দরকারে এসেছিলাম, দাঁড়াব না চলে যাব বুঝতে পারছি না।

সন্ধ্যা তিক্তকণ্ঠে বলে, চলে যাবে কেন ? এ তো লুকোচুরির ব্যাপার কিছু নয়। এদের ব্যবহারটা দ্যাখো না, সাক্ষী থাকো না। মেয়েকে পার করে এখন জামাইকে ফাঁকি দিচ্ছে, ঝগড়া করছে।

কী ঝাঁঝ তার কথায় ! নন্দন ভাবে, সেরেছে। বাপ-ভায়ের বিরুদ্ধে সন্ধ্যা তবে অশোকের পক্ষে !

নিজে সে কলহে কোনো অংশগ্রহণ করছে না বটে, কলহরত স্বামী আর বাপ-ভায়ের দিকে পিছন ফিরে এখানে রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ সমর্থন অশোকের পক্ষে।

এবং কলহ না করলেও সেটা জানিয়ে দিতে সে নিশ্চয় কসুর করেনি। সেই জন্যই এখানে তার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা।

এ রকম ভাবাটা অবশ্য অন্যায় নন্দনের। স্ত্রী স্বামীর পক্ষ না নিয়ে কার পক্ষ নেবে ? স্বামীই তো তার সম্বল এখন। কিন্তু নন্দন কিনা ভাবছিল অন্যায়টা সম্পূর্ণরূপে অশোকের, বাস্তব অবস্থা অশোকের দাবিকে কুৎসিত হীনতায় পরিণত করলেও যে মিথ্যা করে দেয়নি, এটা তার কিনা খেয়ালেও আসেনি—সে তাই ধরে নিয়েছিল সন্ধ্যা বুঝি অশোকের ছোটোলোকোমির বিরুদ্ধে গিয়ে বাপ-ভায়ের পক্ষ নেবে !

সন্ধ্যার ভাব দেখে এবং কথা শুনে এবার ব্যাপারটা খেয়াল করে তার চমক লেগে যায়।

তাই তো বটে।

সন্ধ্যা যে অশোকের সঙ্গে এসেছে তার সোজা সরল মানেই তো এই যে সে বাপ-ভায়ের কাছ থেকে স্বামীর পাওনাটা আদায় করে নিতে স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেই এসেছে।

নইলে সে কি আসত ? এ তো শখ বা সুখের বেড়াতে আসা নয় বাপের বাড়িতে ! ঝগড়া করে টাকা আদায় করতে আসা।

মনেপ্রাণে অশোকের পক্ষে না থাকলে, দুজনে মিলে এসে এ রকম ঝগড়া করে টাকা আদায়ের পরামর্শ না করে থাকলে—বিষের চেয়ে তিতো এই বাপের বাড়ি আসা সে কি মেনে নিত ?

অথবা অশোক তাকে কান ধরে টেনে এনেছে ?

সে ভয়ে এসেছে ? অশোকের চাকরির পয়সায় সারাজীবন তাকে খেতে পরতে হবে জেনে এত বড়ো ব্যাপারে তাকে চটাবার আতঙ্কের তলে চাপা পড়ে গেছে বাপ-ভায়ের জন্য তার স্বাভাবিক সমর্থন ও সমবেদনা ?

কলহে একটু ঢিল পড়েছে বোঝা যায়। চেঁচামেচি কমিয়ে সকলেই একটু ভাববার চেষ্টা করছে, উপায় কী, মীমাংসা কী, এখন কী করা যায় !

নন্দন মৃদুস্বরে বলে, তুমি অশোককে একটু বুঝিয়ে বলতে পারলে না সন্ধ্যা ? রাগ কোরো না, আমার কোনো কথা বলার অধিকার নেই জানি। একদিন ছেলেমানুষি ভালোবাসা হয়েছিল বলেই বিয়ের পরেও তোমাকে উপদেশ দেওয়া চলে না।

সন্ধ্যাও মৃদুস্বরে বলে, ও সব কথা থাক না। কী জ্বালায় আছি তুমি বুঝবে কী। একলা মানুষ, চাকরি কর আর সাধ মিটিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াও। থাক, থাক, ও সব আমি জানি, আমায় বলতে হবে না,—আমার জন্য বিয়ে করনি বলতে যাচ্ছিলে তো ? ও সব ফাঁকির কথার মানে আমি জেনে গিয়েছি।

চাকরি করে মাইনে পাবার স্বাদ আজও পাইনি সন্ধ্যা। একটা মাসের জন্যও পাইনি।

মুখ না ফিরিয়েও কণ্ঠে বিস্ময় ও তিরস্কার ধ্বনিত করে সন্ধ্যা বলে, সত্যি ? আমার জন্যে নয় তো ?

সন্ধ্যার কথা শুনে মনে মনে নন্দনের হাসি পায়। তাকে পায়নি বলে সে চাকরি পর্যন্ত বর্জন করেছে এ কথাটার কোনো মানে নেই—কথাটা বলার একটা মানে আছে। সংসারের ঝঞ্ঝাটে নিজে সন্ধ্যা পেকে গিয়েছে, তাদের এককালের ভালোবাসার ফাঁকি আর ছেলেমানুষি বুঝে গিয়েছে—কিন্তু তাকে সন্ধ্যা ধরে রেখেছে আগের দিনের সেই রকম ছেলেমানুষটি বলে।

তাই সন্ধ্যা বলতে পেরেছে কথাটা—তারই জন্য সে চাকরি করা বাদ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়নি তো ?

ওদিকে ঝগড়াঝাঁটিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে টের পেয়ে নন্দন স্বস্তি বোধ করে।

এখন মিনিট দশ-পনেরো ওরা খাওয়াখাওয়ি করবে।

সন্ধ্যার সঙ্গে চরম অবোঝা-অবুঝির একটু ফয়সালা করার সুযোগ সে পাবে কিছুক্ষণ। সে যে ছেলেমানুষের মতো তাকে ভালোবাসেনি, ছেলেমানুষ ছিল বলেই ভালোবাসার ছলে খেলায় সন্তুষ্ট থেকেছে, এটা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দিলে নিজের প্রাণটা তো তার একটু হালকা হবে !

ওরা ওদিকে ঝগড়া করুক, পরস্পরকে যারা বাঁচাবে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করুক—এই ঝগড়ার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের মিল—আমি বাঁচলে তুমি বাঁচবে, তুমি বাঁচলে আমি বাঁচব, বাঁচার এই খাঁটি নীতি।

সে বলে তোমার আশ্চর্য বোধশক্তি দেখেই তোমায় ভালোবেসেছিলাম। তুমি বোধ হয় ভাব, ভালোবাসাটা অনিয়মে ঘটে, এলোমেলো উলটে-পালটে যথেচ্ছ নিয়মে ঘটে ! এ জগতে ওটা আজ পর্যন্ত ঘটেনি। পেটের খিদে আর প্রাণের ভালোবাসা এক নিয়মে চলে এসেছে।

থিয়োরি খাটিয়ো না, দোহাই তোমায়। আগেও তুমি এ রকম বড়ো বড়ো কথা বলতে।

নন্দন আহত হয় না। রাগ করে না।

থিয়োরি নয়, ফাঁকা কথা নয়। পাস করার জন্য ছেলেবেলা থেকে কী কঠিন তপস্যা করেছি তুমি জানো, পাস করাটাই আজ পর্যন্ত সার হয়ে আছে, আর কিছুই করতে পারলাম না। ছেলেমানুষি ভাবুকতা কি থাকে এ অবস্থায় ? জুলেপুড়ে সব খাক হয়ে গেছে। কী রকম শক্ত নীরস হয়ে গেছে আমার মন—তুমি ভাবতেও পারবে না। কিন্তু তোমায় আমি আজও ভালোবাসি। পাসের খাতিরে তোমায় হারিয়েছি—নিজের এই বোকামির জন্য আমার আপশোশ মরলেও যাবে না। চোখ মেলে যদি একটু তাকাতাম চারিদিকে, যদি একটু বুঝবার চেষ্টা করতাম বাস্তবটা কী দাঁড়িয়েছে—মিথ্যা তপস্যায় মেতে না থেকে যদি একটু হিসাব করতাম তোমার জন্য বাঁচার জন্য কীভাবে লড়াই করা উচিত, কোনটা ঠিক পথ ! হেরে গেলেও আমার আজ আপশোশ থাকত না। লড়াই না করেই বোকার মতো ভুল করে হেরে গেলাম এর চেয়ে লজ্জার কথা, দুঃখের কথা মানুষের আর কী আছে বলো ?

সন্ধ্যা মুখ ফিরিয়ে তাকায় !

কষ্ট হয় আমার জন্য ?

হয়—বিশেষ এক রকম ভাবে হয়। তোমার জন্য কষ্টটা অন্য সব কষ্টের সঙ্গে মিশে গেছে। তোমার কথা ভাবলে প্রাণের সমস্ত ব্যথা-বেদনা জ্বালা পোড়া একসঙ্গে নাড়া খায়। কত কাজ করার থাকতে শুধু অকাজ নিয়ে মেতে থেকে জীবনটা নষ্ট করলাম।

সন্ধ্যা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে, ও কথা বলতে নেই। কত যেন বুড়িয়ে গেছ, জীবনটা যেন ফুরিয়ে গেছে।

নন্দন বলে, সমস্ত জীবনটার কথা বলিনি—এতদিন জীবনটা বোকার মতো নষ্ট করার কথা বলেছি। বাকি জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়, এবার সেই যুদ্ধ শুরু করব বইকী !

ঝগড়া চলেছিল সমানে—চড়া গলায়। কে কী বলছে না বলছে সেদিকে তারা কান দেয়নি। হঠাৎ তারিণীর গলা-চেরা আর্তনাদে দুজনে তারা চমকে ওঠে।

আর্তনাদ করে ভগবানের কাছে মরণ প্রার্থনা করতে করতে তারিণী মেঝেতে কপাল ঠুকছে !

সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে বাপকে জড়িয়ে ধরে। সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অশোকও যেন ঝিমিয়ে গেছে মনে হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অশোক প্রায় কাতরভাবে বলে, সত্যি বলছেন টাকা নেই ? ঊষার বিয়ের জন্যও কিছু জমাননি ? তাই থেকে আমায় ধার দিন টাকাটা—আমার দায়টা উদ্ধার হোক। ছ-মাসের মধ্যে আমি যেভাবে পারি টাকা শোধ করব।

এতক্ষণে যেন স্পষ্ট হয়, মানে খুঁজে পাওয়া যায় অশোকের এ রকম মরিয়া হয়ে নাছোড়বান্দার মতো টাকা আদায়ের চেষ্টা করার। ঊষার বিয়ের জন্য টাকা জমানো আছে ধরে নিয়েছে বলেই তার এত রাগ, এত জবরদস্তি।

নইলে নরেনের চাকরি গেছে জেনেও কী এমন জোরের সঙ্গে দুজনে তারা টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পারত !

নরেন মৃদুস্বরে বলে, ঊষার বিয়ের জন্য জমানো টাকা ? সন্ধ্যার বিয়ের দেনা কত বাকি আছে জিজ্ঞেস করো বরং।

পরদিন সকালে সে মাধবের বাড়ি যায়।

পাঁচখানা বই খুলে সামনে সাজিয়ে রেখে মাধব একখণ্ড আলগা কাগজে কী সব নোট করছিল।

ঠিক যেন মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে সে বলে, আসুন, বসুন।

গলা সামান্য একটু চড়িয়ে বলে, দুকাপ চা দিয়ো।

তারপর বলে, মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে ?

ভুলে যান কেন চাকরি নেই ?

সে রকম শুকনো নয়। মনে হচ্ছে যেন বড়োই মনঃকষ্টে আছেন।

চাকরি নেই, মনঃকষ্টে থাকবেন না ?

কথাটা বলে মানসী।

যেন নরেনের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলে।

সে চা নিয়ে আসেনি। জানায় যে চায়ের জল চাপিয়ে এসেছে।

মাধব বলে, তুমি বুঝলে না আমার কথাটা।

বুঝিয়ে দিলেই বুঝব।

মাধব একটু ভাবে। একবার নরেনের দিকে একবার মানসীর দিকে তাকায়। তারপর ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বলে, আমি বলছিলাম মুখের ভাবের কথা। মুখের ভাবেরও তো রকমারি আছে ? রোগ হলে এক রকম, রাগ হলে এক রকম, মনে কষ্ট হলে এক রকম—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। চাকরি না থাকলে কী রকম মুখের ভাব হয় বলো তো, শুনে রাখি, শিখে রাখি ?

মাধব হাসে। খুব যেন খুশি হয়েছে মানসীর কথা শুনে। সানন্দে একটা সিগারেট ধরায়।

বলে, জ্ঞানবিজ্ঞান কোথায় পৌঁছেছে জানো না, তাই ভাব আমি বুঝি এলোমেলো বকছি। অ্যাটম বোমা কি আকাশ থেকে নেমে এসেছে মানুষের হাতে ? অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় মানুষ অধিকার করেছে অ্যাটম বোমা। লক্ষণ দেখে, কারণ দেখে, সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝতে পেরে, তবে আবিষ্কার করেছে। মনের ভাবের ছাপ মানুষের মুখে পড়বে এ তো মোটা কথা।

মানসী যেন নিজে তর্ক করে, নরেনের সঙ্গে মাধবের তর্ক ঠেকিয়ে রাখবে, পণ করে ঘরে এসেছে। মাধবের কোনো কথাই সে এখন মানবে না, সব কথার প্রতিবাদ করে তর্ক চালিয়ে যাবে।

সে গম্ভীর হয়েই বলে, মুখের ভাব দেখে বলতে পারবে আমার খিদে পেয়েছে না পেটের অসুখ হয়েছে !

মাধব অনায়াসে বলে, শুধু মুখের ভাব কেন ? তোমার মুখের ভাব দেখে যেটা বুঝতে পারছি, তোমার চালচলন কথাবার্তায় সেটার প্রমাণ পাচ্ছি।

কী হয়েছে আমার ?

রাগের চোটে তোমার মাথা ধরেছে, গা বমিবমি করছে।

খুব বলেছ। এই তুমি সবজান্তা পণ্ডিত ? আমার বলে ঘুম হয় না অর্ধেক রাত ছটফট করি—

মাধব একটু হেসে বলে, ওটা তোমার রাগেরই আরেকটা লক্ষণ। রাগের জন্য এখন তোমার মাথা ধরে আছে, গা বমিবমি করছে—রাগের জন্যই রাত্রে ঘুম আসবে না।

মানসী যেন একটু চটে যায়।

রাগের আবার কী দেখলে তুমি ? কখন আবার আমি রাগারাগি করলাম তোমার সঙ্গে ?

মাধব সঙ্গে সঙ্গে বলে, করলে না বলেই তো এ রকম হয়েছে ! রাগটা ক-দিন ভেতরে চেপে রেখেছ, দেখাচ্ছ যে রাগ তোমার হয়নি। রাগারাগি করলে তো ফুরিয়েই যেত—রাত্রেও ঘুমোতে, মাথাও ধরত না, গা বমিবমিও করত না।

মানসী হালকা সুরে বলবার চেষ্টা করে, কী বলছ পাগলের মতো ? এর মধ্যে নতুন করে রাগের কী কারণ ঘটেছে ? বিনা কারণে রাগব কেন ? রাগ হলে আমি কখনও চেপে রাখি !

মাঝে মাঝে চেপে রাখ বইকী !

কখখনো না !

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি এখন আসি। একটু দরকার ছিল—

মানসী ফোঁস করে ওঠে, না, উঠবেন না। এতক্ষণ শুনলেন, বাকিটা শুনে তবে যাবেন। কেমন বানিয়ে বানিয়ে প্যাঁচালো কথা বলে আমায় জব্দ করে একটা প্রমাণ নিয়ে যান।

মাধবের দিকে চেয়ে বলে, আমি রাগ করেছি, আমিই জানি না কেন রাগ করেছি ? অবচেতনার রাগ নাকি আমার ?

মাধব বলে, না, এমনি রাগ। রাগ যে হয়েছে তাও তুমি জানো, কেন রেগেছ তাও জানো, রাগটা চেপে যাবার চেষ্টা করছ। একটুও রাগ দেখাওনি কিনা তাই ভেবেছ আমি টের পাব না রেগেছ, কেন রেগেছ।

মানসী আবার ফোঁস করে ওঠে, ছলনা করছি ?

মাধব বলে, করছ বইকী ! তবে তোমার উদ্দেশ্যটা ভালো।

মানসী চেঁচিয়ে বলে, বলো কেন রেগেছি। তোমায় বলতে হবে।

মাধব একটু চুপ করে থাকে।

মানসী আরও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, বলো। না বললে চলবে না। সব বিষয়ে তোমার বাহাদুরি।

মাধব ধীরে ধীরে বলে, বলতে আপত্তি কী ? দিল্লির চাকরিটা নিইনি বলে তুমি রেগেছ।

তুমি কোন চাকরি নেবে না নেবে—

তাতে তোমার কিছু আসে যায় না ? এ কী একটা কথা হল মনু ! তোমার খুব ইচ্ছা ছিল অফারটা নিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে যখন পরামর্শ করছিলাম, এ চাকরি কেন আমার পোষাবে না বোঝাচ্ছিলাম, মনের ইচ্ছাটা তুমি চাপতে পারনি। তবে জোর করে তুমি বলনি—চাকরিটা নিতেই হবে। তুমি তো জানো বলে লাভ নেই, টাকার জন্য আমি আদর্শ ছাড়ব না, নিজেকে বিক্রি করব না।

আমি কোনোদিন বলেছি আদর্শ ছাড়তে, নিজেকে বিক্রি করতে ?

সোজাসুজি তা বলনি। কিন্তু এমন অনেক কিছু আমাকে করতে বলেছ যার মানেই দাঁড়ায়—

ওই যা ! কখন উনুনে কেটলি চাপিয়ে এসেছি !

মানসী যেন পালিয়ে যায়।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, আপনি একটা ভুল করলেন। আমার সামনে এভাবে ওঁকে জব্দ করা উচিত হল না।

মাধব বলে, আপনি ভুল বুঝলেন। কথাটা ও তুলেছিল আপনার সামনে আমাকে জব্দ করতে। আমি ওর ভুল ধারণাটা সংশোধন করে দিলাম। ও ভেবেছে মনের মধ্যে চেপে রাখলেই বুঝি মনের বড়ো বড়ো কথা আমার কাছে গোপন করা যায়। এখনও বুঝতে পারেনি যে আমার এটা বাহাদুরি নয়, পাণ্ডিত্য নয়। এর মধ্যে ম্যাজিক কিছুই নেই। একসঙ্গে চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা ঘুমানো থেকে সব কিছু চলছে ক-বছর ধরে—কারও পক্ষে অন্যের কাছে কিছু গোপন রাখা সম্ভব ? মিল আর অমিল সব ধরা পড়ে যাবেই। মানে বুঝতে না পারা আলাদা কথা, কেন এ রকম হল কেন ও রকম হল না বুঝলে আসে যায় না। আসে যায় না মানে, আমাদের পক্ষে আসে যায় না।

মানসী যেন তার কথার জবাব দেবার জন্যই তৈরি চা নিয়ে ঘরে আসে—চা দেবার জন্য নয়। কারণ, কাপে চা ঢেলে দেবার চেষ্টামাত্র না করে সে বলে, মিছে আমার বদনাম দিচ্ছ। এ কী অন্যায় কথা বলো তো ? তুমি মস্ত বিদ্বান বলেই যা খুশি বলবে তাই ঠিক ধরে নিতে হবে ? তুমি উলটো

বুঝেছ। দিল্লির চাকরি নাওনি বলে রাগ করব ? চাকরিটা নিতে চাইলেই বরং আমি রাগ করতাম, নিলে রাগ করতাম। কেন জানো ?

চা-টা দিয়েই বলো না ?

মানসী নীরবে কাপে চা ঢেলে দেয়—নিখুঁতভাবে, লালিত্যপূর্ণভাবে।

বলে, আমায় তুমি খুব বোকা ভাব। বেশ আমি বোকা। আমায় তুমি স্বার্থপর ভাব। বেশ আমি স্বার্থপর। স্বার্থপর নিজের স্বার্থ দেখবে তো ? স্বার্থের হিসাবটা ভালো বুঝবে তো ? দিল্লির চাকরি তোমায় আমি নিতে দিতাম না—ক-মাস বাদে চাকরি খুইয়ে এই ভদ্রলোকের মতো বেকার হবে বলে। তোমার ধাত আমি জানি। তোমার থিয়োরি অনুসারেই জানি—এইমাত্র তুমি এঁকে বলছিলে যে বোঝাপড়া থাক বা না থাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে কেমন মানুষ অজানা থাকে না। আমি জানি ও চাকরিটা নিলেও তুমি বেশি দিন চালাতে পারতে না—তোমার ধাতেই বরদাস্ত হত না। নিজের স্বার্থেই আমি তাই তোমায় চাকরিটা নিতে দিতাম না।

মাধব ধীরে ধীরে বলে, পারলে না। আমিও এই কথাই বলেছি। চাকরিটা নিলাম না বলেই তোমার রাগ—রাগটা তুমি চেপে গেছ আমার ধাত জানো বলে। তুমি জানো বইকী যে রাগ দেখিয়ে চাকরিটা নেওয়ালেও লাভ নেই—বেশি দিন আমি চালাতে পারব না। আমার এই ধাতটা মেনে নিতে হচ্ছে বলেই তোমার রাগ।

মানসী চুপ করে থাকে।

বরাবর যেভাবে তর্কে হেরে চুপ করে যায়।

এবার নরেন দারুণ অস্বস্তি বোধ করে।

তার সামনে এতক্ষণ দুজনের কলহ চালানোর মধ্যে এমন একটা নাটকীয় অবাস্তবতা ছিল, এমন একটা অসাধারণতা ছিল, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে দাম্পত্যকলহকে বুদ্ধির লড়াই করে রাখার এমন একটা চেষ্টা ছিল যে দুজনের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ঝাঁঝ পেয়েও নরেন তেমন বিচলিত হয়নি।

হার মেনে মানসী চুপ করে যাওয়ামাত্র যেন বাস্তব হয়ে গেল দুজনের কলহ—স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সত্যটা যে বুদ্ধির লড়াই থেমে গেছে, আসল লড়াই আরম্ভ হচ্ছে না কেবল তার জন্য। সে বিদায় নেবার পরেই ওদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে পরস্পরের প্রতি কদর্য নিষ্ঠুর আক্রমণ !

দুজনেই সাময়িকভাবে ঘায়েল হয়ে যাবে সে লড়ায়ে !

সে উঠে দাঁড়ায়।

প্রায় কাতরভাবে আতঙ্কের সঙ্গে মানসী বলে, আরেকটু বসুন না ?

মাধবও অনুরোধ জানায়, বসেই যান না খানিকক্ষণ। বেকার মানুষ, ঘুরে বেড়িয়ে কী করবেন ?

দুজনেই চায় সে আরও কিছুক্ষণ বসুক ! পিছিয়ে যাক তাদের কামড়াকামড়ি, গায়ের জ্বালার উত্তাপ খানিকটা উপে যাক, মাথা খানিকটা ঠান্ডা হোক, মেজাজ খানিকটা নরম হোক।

অগত্যা সে বসে।

মাধব একটা সিগার বাড়িয়ে দিলে অগত্যা সেটা ধরায়।

ঠান্ডা বরফ হয়ে গিয়েছিল মানসীর কাপের চা।

এক চুমুকে শরবতের মতো নিজের চা-টা খেয়ে মানসী বলে, এত লোকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা—ওঁকে একটা চাকরি দিতে পার না ?

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে কিছু না বলেই গটগট করে বেরিয়ে যায়।

৪

না। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয় না।

মেঘ না হলে বজ্র পড়ে না।

দেড়দিন বন্ধ থাকার পর সেদিন দোকান খুলবে। সকালে যথারীতি কাজে গিয়ে দোকানের নিজস্ব তালার উপর অন্য লোকের লটকানো তালা দেখে প্রায় অশিক্ষিত দীননাথের মনে হয় না, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছে।

ছাঁটাই হয়ে নরেন যেমন ভেবেছিল।

সকাল থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত দোকানে তার সময় কাটে দোকানের কাজে, ভেতরের ব্যাপার সব না জানলেও খানিকটা সে আঁচ করেছিল বইকী।

গোবিন্দের ভাবসাব, চালচলন দেখে তারও আশঙ্কা হয়েছিল বইকী যে এ রকম একটা কিছু ঘটবে।

দোকানের সামনে দীননাথ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু গোবিন্দ বা তার বাড়ির কেউ দোকানে আসে না। একটা লরিতে কয়েকজন লোক নিয়ে হাজির হয় ভুবন !

বলে, কী খবর দীননাথ ?

আজ্ঞে খবর আর কী, দোকানে কারা তালা এঁটে দিয়েছে দেখছি।

ভুবন নতুন তালা খুলতে খুলতে হেসে বলে, আমরাই দিয়েছি। আমাদের বেচে দিয়েছে দোকানটা।

দীননাথ যন্ত্রের মতো বলে, বেচে দিয়েছে ?

নতুন তালা চাবি দিয়ে খোলার পর পুরানো তালা ভাঙার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ভুবন লোক সঙ্গে করেই এনেছিল।

দীননাথ বলে, আজ্ঞে চাবিটা আনিয়ে নিলে হত না ?

ভুবন বলে, আর বলো কেন গোবিন্দ ছোঁড়াটার কথা—একনম্বর শয়তান। দোকানের চাবি পকেটে নিয়ে বজ্জাতটা কোথায় সটকেছে—কাল সকাল থেকে পাত্তা নেই। কাগজপত্র সই করে বুড়ো বলল, গোবিন্দ বাড়ি ফিরলেই চাবি পাঠিয়ে দেবে। সকালে লোক পাঠালাম—ছোঁড়া এখনও ফেরেনি।

দোকান বেচে দিয়েছে গোবিন্দেরা, দোকানের নূতন মালিক হয়েছে। কিন্তু দোকানটা আছে। সে এতকাল কাজ করছে দোকানে, তার কাজটাও নিশ্চয় বজায় থাকবে।

কিন্তু লরি কেন ? লরিতে মাল তুলবার কুলিরা সঙ্গে কেন ?

ভরসা করে মুখ ফুটে ভুবনকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

তালা ভেঙে দোকান খুলে দোকানের মাল লরিতে তোলা আরম্ভ হলে সে আর চুপ করে থাকতে পারে না।

দোকানটা চালাবেন না, আজ্ঞে ?

না—জামাকাপড়ের এইটুকু দোকান চালিয়ে কী লাভ ? মালপত্র বড়ো দোকানে চালান করে দিচ্ছি। এ দোকানে শুধু উল থাকবে।

মোর কাজটা থাকবে তো, আজ্ঞে ?

তোমার কাজ ?

ভুবন তার মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবে। দীননাথ তাড়াতাড়ি বলে, উলের দোকানে নাই যদি হয়, কাপড়ের দোকানে একটা কাজ দেবেন তো মোকে ? কাজ গেলে খাব কী !

ভুবন দুবার মাথা হেলিয়ে তার কথায় সায় দেয়, স্বীকার করে নেয় তার কাজ থাকার প্রয়োজনটা। ধীরে ধীরে বলে, দ্যাখো, তুমি বুড়ো মানুষ, গরিব মানুষ। মিথ্যে আশা দিয়ে তোমায় আমি ভোগাব না। কাপড়ের দোকানে লোকের দরকার নেই—একজনাকে বরং ছাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছি। উল বেচার কাজ তুমি পারবে না।

দীননাথ মূঢ়ের মতো চোখ চেয়ে থাকে।

তোমার পাওনাগন্ডা সব মিটিয়ে দেব—আজকেই দেব।

কী উদারতা ! দীননাথ একটা নিশ্বাস চেপে যায়।

এক মাস মোটে বাকি ছেলের পরীক্ষার।

দোকান উঠে যাবার খবরটা দীননাথ একেবারে চেপে যায়।

নন্দনের বাড়ি থেকে জেনে এসে নরেন পাছে কিছু বলে বসে এই ভয়ে সে তাকেও সাবধান করে দেয়, বাড়িতে বোলো না কিন্তু বাবা। কিছু যাতে জানতে না পারে—মন বিগড়ে যাবে ছেলেটার। পরীক্ষাতক চুপচাপ কাটিয়ে দেব ভাবছি। রোজ ঠিক সময়ে বেরিয়ে যাব।

নরেন তখন পর্যন্ত খবর জানত না, সে আশ্চর্য হয়ে বলে, কী, বলব না বাড়িতে ?

দীননাথের কাছে খবর জেনেই সে নন্দনদের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

নন্দন প্রথম কথাই বলে, দুবেলা দুটো পোড়াভাত জুটছিল, এবার তাও বন্ধ হবে। এতদিন দোষ দেওয়া যেত, এবার কিছু বলতেও পারব না।

নরেন বলে, কী করে গেল দোকানটা ?

দেনায় বিক্রি হয়ে গেল। জ্যাঠার যেমন বুদ্ধি—গোবিন্দের মতো ভদ্রবাবুকে দিলে দোকান চালাতে ! দোকান বড়ো করবে, ফাঁপিয়ে তুলবে, লাখপতি হবে ! ছোটো একটা দোকান চালাতে না শিখেই বড়োবাজারের সঙ্গে পাল্লা দেবে !

কিছুই বাঁচেনি ?

কে জানে ! আমায় কী ভেতরের কথা কিছু জানায় ? অল্পবিস্তর কিছু নিশ্চয় পাওয়া গেছে।

নরেন ভেতরে গিয়ে প্রথমেই ছবিরাণীর মুখের দিকে তাকায়।

এবারও মুখখানা তার একটু কাঁদো কাঁদো দেখাবে না ? অন্তত একটু ম্লান দেখাবে না ?

ছবিরাণীর চেনা মুখে অচেনা দুঃখ বেদনার কোনো ছাপ না দেখে সে সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

তারপর ভাবে, না, এত তাড়াতাড়ি তার মুখ কাঁদো কাঁদো হবার তো কথা নয় ! সংসার চালাবার উপায়টা হাতছাড়া হয়ে গেছে এটা তার কাছে শুধু বড়োদের দুর্ভাগ্যের কথা, একটা দুর্ঘটনা।

অন্য ব্যবস্থা একটা ওরাই আবার করবে নিশ্চয় ! এ ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কী দরকার ?

মুখ সে ম্লান করতে যাবে কী জন্য ?

গৌরী বলে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা।

শুনলাম সব।

গোবিন্দ শুকনো ম্লানমুখে বলে, বাহাদুরি করতে গিয়ে একেবারে ডুবিয়ে দিলাম সংসারটাকে।

নরেন তাকে যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভুলচুক হয়ে যায় মানুষের—তুমি তো আর বদখেয়ালে দোকানটা নষ্ট করনি, ভালোই করতে চেয়েছিলে।

তফাতটা কী হল ? বদখেয়ালে নষ্ট করলে যা হত, এতেও তাই দাঁড়াচ্ছে। বোকামিও বদখেয়াল বইকী।

নরেন মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, না, বদখেয়ালে দোকান নষ্ট হলে তোমার কোনো শিক্ষাই হত না—কিন্তু এতে তোমার অভিজ্ঞতা জন্মাল। আস্তে আস্তে তুমিই আবার গড়ে তুলবে।

গৌরী আপশোশের সঙ্গে বলে, আর গড়ে তুলেছে ! কী দিয়ে গড়বে ? সব জলে দিয়ে এল।

নরেন বলে, যা বেঁচেছে—

গোবিন্দ বলে, পানবিড়ির দোকান দেওয়া যেতে পারে।

তাই নয় দেবে। নয় অন্য কিছু করবে।

হেমেন্দ্র ঘরের ভিতর থেকে তাদের কথা শুনছিল, এবার ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, যা অবস্থা দেখছি চারিদিকে, আশা-ভরসা নেই আর। চাকরি-বাকরি একটা করবে এ আশাটুকু যে করব তাও তো নিজের ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। আজ পর্যন্ত নন্দনটার একটা হিল্লে হল না। বুড়ো বয়সে কত দুঃখ আছে আমার পোড়াকপালে।

বলতে বলতে হেমেন্দ্র আবার ঘরে চলে যায়। গৌরী যায় ঘর সংসারের কাজে। গোবিন্দ মুখভার করে অন্যদিকে চেয়ে বসে থাকে।

ছবিরাণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগের জন্য নরেন অনেকক্ষণ এ বাড়িতে কাটিয়ে দেয়। বৈঠকখানায় একা বসে থাকে মিনিট দশেক। কিন্তু ছবিরাণী গা না করায় কথা বলার সুযোগটা আর ফুটে ওঠে না।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি, ক্রমে ক্রমে নরেনের খটকা লাগে যে এ বাড়ির মানুষগুলি তো আগের মতো ব্যবহার করছে না তার সঙ্গে ! নন্দনের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই এরা করুক, নন্দনের বন্ধু বলে তাকে কোনোদিন অবহেলার ভাব কেউ দেখায়নি। সেটা বোধ হয় এদের হিসাবেই আসত না। সোজাসুজি অবজ্ঞার ভাব না দেখিয়েও আজ যেন এরা বেশ একটু অগ্রাহ্য করে চলছে তার উপস্থিতিকে।

এদের মন খারাপ বলে ?

অথবা তার চাকরি নেই বলে ?

কিন্তু দোকানটা গেছে বলে যতই মন খারাপ হোক তাকে তুচ্ছ করার মনোভাবে তো সেটা প্রকাশ হওয়ার কথা নয়।

এ তো ঠিক ম্লানমুখে চুপ করে থাকা নয় !

অগত্যা বিদায় নিয়ে গৌরীর সামনে নরেন ছবিরাণীকে বলে, তুমি যে আর আমাদের বাড়ি যাও না ছবি ? উষা তোমার কথা বলছিল।

যাব। উষাকে আসতে বোলো।

কী ভেবে ছবিরাণী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে, আচ্ছা, আমিই যাব আজকে দুপুরবেলা। ঠিক যাব।

দুপুরবেলা ছবিরাণী যে আসবে বলেছে এ কথা সে ইচ্ছা করেই উষাকে কিছু জানায় না।

দুপুরবেলা উষা কাছেই এক বাড়িতে তার সখী তমালের কাছে যায়।

পাড়ার আরও তিন চারটি বয়স্কা কুমারী মেয়েও গিয়ে জোটে—যে যতক্ষণের জন্য পারে। তমালের ঘরে বসে তারা গল্প করে, মেয়েলি আড্ডা বসায়।

বাড়িতে পুরুষ বলতে তমালের বাবা প্রভাত একা, দুপুরে সে থাকে আপিসে। সময় থাকলে দুপুরবেলা মেয়েদের ও বাড়িতে যেতে আসতে তাই কোনো বাড়িতে আপত্তি করা হয় না।

ছবিরাণী যখন আসে প্রতিদিনের মতো উষা আড্ডা জমাতে গেছে, মা ও ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

নরেন বলে, আমি জানি তুমি কী বলবে।

তুমি জানতেই পার না। একেবারে অসম্ভব জানা তোমার পক্ষে।

জানি। তুমি বলতে এসেছ যে তাড়াতাড়ি তোমায় বিয়ে দিয়ে পার করার চেষ্টা চলছে—এখন আমি কী বলি।

ছবিরাণী আশ্চর্য হয়ে বলে, বড়দার কাছে শুনেছ ? কিন্তু বড়দার তো জানবার কথা নয় এখনও ! শুধু মা আর দাদুর মধ্যে গোপনে পরামর্শ হয়েছে।

নরেন হেসে বলে, গোপনে পরামর্শ হয়ে থাকলে তুমি জানলে কী করে ? তোমাদের বাড়িতে কারও গোপনে কিছু বলাবলি করার জো নেই, না ? সেদিন তুমি আড়াল থেকে নন্দন আর আমার সব কথা শুনেছিলে !

ছবিরাণীও হাসে।

শুনেছিলাম তো ! আমি কৌতূহল চাপতে পারি না কী করব ? কিন্তু তুমি কী করে জানলে বলো না ?

অনুমান করলাম। সংসারের এই তো রীতি। দোকানটা গেল মানেই সামনে দুরবস্থা, আর হয় তো পারাই যাবে না তোমাকে পার করতে। তার চেয়ে নগদ আর গয়নাগাঁটিগুলি বজায় থাকতে থাকতে চোখ-কান বুজে তোমাকে পার করে দিতে পারলেই চুকে গেল। তারপর কপালে যা থাকে হবে।

আশ্চর্য তো ! মা আর দাদু ঠিক এই কথাগুলি বলাবলি করছিল ! তোমার সাংসারিক বুদ্ধি তো ভারী টনটনে !

টনটনে বুদ্ধি দরকার হয় না। এ অবস্থায় আর পাঁচজনে যা করত তোমার মা আর দাদুও তাই করছে। তুমিই হলে একমাত্র দায় যা ঘাড় থেকে নামানো চলে। অন্য দায় ঘাড়ে থাকবেই—খাওয়াপরা জুটুক আর নাই জুটুক।

ছবিরাণী বলে, ভাবলেও রাগ হয়, কিন্তু রাগ করব না। একটা কথা কিন্তু তুমি বলতে পারনি, পারবেও না। আচ্ছা, আরেকটু জানিয়ে দিই, দেখি বলতে পার কিনা। শুধু আলগা পরামর্শ হয়নি। ব্যবস্থার কথাও হয়েছে। একটি পাত্র আছেন, খুব কম মাইনে হলেও চাকরি করেন। বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো না হলেও একরকম চলে যায়। বোধ হয় চাহিদাও বেশি হবে না। কাজেই বুঝতে পারছ ব্যাপার ? হয়তো এই ফাগুনেই দাদু সব চুকিয়ে দেবে।

ছবিরাণী একটু হাসে। সত্যই হাসে। বলে, এবার ঠিক করে বলো তো আমি কেন এসেছি।

পরামর্শ করতে। আমাকে সব জানিয়ে সাবধান করে দিতে যে, সময় থাকতে ব্যবস্থা কর।

সাবধান করে দিতে এসেছি ঠিক, কিন্তু পরামর্শ করতে আসিনি। আমি কী ঠিক করেছি জানিয়ে দিতে এসেছি।

নরেন আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কী করবে ঠিক করে ফেলেছ ?

হ্যাঁ। ঠিক করেছি বাধা দেব না।

নরেনের মুখের ভাব দেখে ছবিরাণীর মুখ এবার গম্ভীর হয়, উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন একটু ম্লানও দেখায়।

বলে, অবশ্য তুমি যদি কিছু না কর। তুমি যদি এর মধ্যে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে পার তাহলে তো কথাই নেই—ওখানে কেউ আমাকে ঠেলে দিতে পারবে না। ঠেলে দিতে চাইবেও না। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে কিছু করতে না পারলেও তুমি যদি জোর দিয়ে বলতে পার যে দু-তিনমাসের মধ্যে একটা কিছু জোগাড় করে নিতে পারবে, আমি যে করে পারি এটা পিছিয়ে দেব।

নরেন কথা বলে না। নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে। সে চাউনিতে যে কতরকম ভাব মেশানো !

কিছু বলছ না যে ?

কী বলব ? আমার কিছু বলার নেই। আমার বলার অপেক্ষা না করেই তুমি তো মনস্থির করেই ফেলেছ।

এবার ছবিরাণীর মুখে নেমে আসে একটা থমথমে ভাব।

সে ধীরে ধীরে বলে, দ্যাখো, আমি প্রাণ খুলে আমার কথাটা তোমায় বোঝাতে এসেছি। না বুঝে কিছু ধরে নিয়ো না, রাগ কোরো না। রাগ অভিমান পরে হবে, আগে বোঝাবুঝিটা হোক। আমি কী এটা চাই ? ভাবলেও আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে না ? কিন্তু জানি তো ইচ্ছা করলেই সত্যিসত্যি মরতে পারব না, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতেই হবে।

অমন করে বাঁচার চেয়ে---

ও সব কথা বোলো না। আমি ও সব বড়ো বড়ো কথা জানিয়ো না, বুঝিয়ো না। আমি বাবা একেলে মেয়ে---দেখছি তো সংসারের অবস্থা। উড়োকথায় চিড়ে ভেজে না জানি। একদিন তোমার চাকরি হবেই যদি ভরসা থাকত, মা আর দাদুর সঙ্গে লড়াই করে আমি এটা ঠেকাতাম।

কোনোদিন চাকরি হবে না আমার ?

একটা চাকরিই বড়দার হয় না, তোমার পাওয়া চাকরিটা গেল। আবার কী ভরসা আছে ? এটা যদি ঠেকাই, আমার কী অবস্থা হবে বুঝে দ্যাখো। মা আর দাদার ঘাড়ে পড়ে থেকে লাথিঝাঁটা খেয়ে জীবন কাটবে।

আরও বেশি আহত বা আশ্চর্য হবার ক্ষমতা নরেনের ছিল না। ছবিরাণীরও অবিকল তার বাড়ির লোকের হিসাব—চাকরি পেয়ে তার চাকরি গেছে, তার দ্বারা আর কিছু হবে না !

একটু ঝাঁঝালো হাসির সঙ্গে সে বলে, তবে এটাই লেগে যাক। চাকরে বর পাচ্ছ, ছাড়বে কেন ?

এটা তো রাগের কথা বললে।

রাগ হয়েছে বলব না ? অন্যকথা বলে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না।

বোঝাবার চেষ্টা করো না ? কী বলতে চাও বলো, দেখি বুঝতে পারি কি না ?

নরেন বলে, তুমি ধরে নিয়েছ নন্দনের কপালে চাকরি জোটার সামান্য একটু আশা যদিই বা থাকে, আমার বেলা আর কোনো আশা নেই। আমার চান্স আমি পেয়ে গেছি, আর পাব না।

ছবিরাণী শান্তমুখে চেয়ে থাকে।

কত লোকের কাজ নেই জানো ?

অনেক লোকের নেই।

কত লোকের চাকরি গেছে জানো ?

অনেক লোকের গেছে।

সারাজন্মে এরা আর চাকরি পাবে না ? এই অবস্থা চিরদিন বজায় থাকবে ? তোমার ঘটে এটুকু বুদ্ধি নেই যে বুঝতে পার, এ রকম ভয়ানক অবস্থা বেশি দিন আর চলতে পারে না ? এ অবস্থা পালটে যাবেই ?

কী করে যাবে ? কে পালটাবে ?

আমরা পালটাব, যারা কাজ করতে চেয়ে কাজ পাই না। দেশের লোকে পালটাবে, যারা দেশকে ভালোবাসে। এ অবস্থা যারা কোনোমতে মানবে না সইবে না।

ছবিরাণী একটু রাগে।

ঘরের কোণে থাকি বলে কী ভেবেছ এ সব কথা কানে আসে না ? পেটে বেশি বিদ্যে নেই বলে, মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজটাও পড়ি না ?

তাই তো মনে হচ্ছে কথাবার্তা শুনে !

ছবিরাণী আরও রেগে বলে, রাগ কর আর টিটকারি দাও, আমি সব জানি। তোমাদের নিজেদের দোষেই কোনোদিন তোমাদের চাকরি হবে না। চাকরি নেই বলে তোমরা হাঙ্গামা জুড়েছ, চাকরির ব্যবস্থা করতে দিচ্ছ না।

নরেন হেসে বলে, কই, আমি তো কখনও কোনো হাঙ্গামা করিনি ! নিরীহ গোবেচারির মতো আপিসের দরজায় চাকরি ভিক্ষে চেয়ে ফিরছি।

ছবিরাণী এতটুকু দমে না।

এ পর্যন্ত করনি, কাল তুমিও হাঙ্গামা করবে। যে ঝাঁঝ তোমার কথায় ! মনে রেখো, অন্যেরা হাঙ্গামা করছে বলে তোমারও চাকরি হচ্ছে না।

নরেন একটু হেসে বলে, কিংবা হাঙ্গামা না করে চুপচাপ সব সয়ে এসেছি বলেই আমার এই দশা ?

কে জানে ছবিরাণী কী জবাব দিত তার এ কথার, ও ঘর থেকে মা-র প্রশ্ন আসে, কার সঙ্গে কথা বলছিস নরেন ?

ছবি এসেছে।

এ ঘরে পাঠিয়ে দে। উষাটার রোজ দুপুরে বেরোনো চাই, বললেও শুনবে না। মরণ নেই আমার !

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ছবিরাণী নরেনকে মুখ খুলতে নিষেধ করে।

আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম মাসিমা—

বলতে বলতে সে ও ঘরে যায়।

৫

জীবনটার মানে তা হলে কী দাঁড়াল ?

আপনজন বাতিল করেছে।

জোয়ান বেকারকে মানা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

বন্ধুরা বাতিল করেছে।

বেকার বন্ধু কথায় কথায় চটে যায়, অপমানিত হয়, কথাবার্তায় রসকষ রাখতে পারে না। আবার টাকাও ধার চায় !

ছবিরাণী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, যে কোনোদিন চাকরি-বাকরি তার আর জুটবে না, হাসিখুশি ছবিরাণীও অগত্যা মুখের হাসি মুছে ফেলে তাকে বাতিল করেছে !

তাকে বাতিল না করে ছবিরাণীরও উপায় নেই।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে এভাবে বাতিল হয়ে, ছবিরাণীর কাছে বাতিল হয়ে নরেন যেন একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া স্বস্তি বোধ করে।

এরা বাতিল করেছে—আর এদের খাতিরে মান-সম্মান মনুষ্যত্ব বাতিল করে চাকরির জন্য কর্তাব্যক্তিদের গেটে গেটে দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দেওয়ার তার দরকার হবে না।

নিজেকে বাজে তুচ্ছ অমানুষ মনে করার প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে।

সে কারও ধার ধারে না।

ইচ্ছা করলে গায়ের জ্বালায় যে আপিসে থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে আপিসে আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়ে সে জেলে যেতে পারে।

কেউ বলতে পারবে না যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে সে ঝোঁকের মাথায় নিজের খেয়ালখুশিতে জেলে গেল !

ছাঁটাই হয়েছে। বিনা নোটিশে বেকার হয়েছে।

কিন্তু এদিক দিয়ে সে যেন স্বাধীনও হয়েছে।

ইচ্ছা হলেই সে যে কোনো মিটিংয়ে গিয়ে চাকরি দেওয়ার মালিকদের বিরুদ্ধে জোর গলায় জেহাদ ঘোষণা করতে পারে। তার মতো যারা কাজ চায় খাটতে চায় সামান্য মজুরির জন্য, অথচ কাজ পায় না খাটতে পায় না—তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে-ও বলতে পারে, চুলোয় যাক। চুলোয় যাক এ সব লোক আর এ সব লোকের অনিয়ম অব্যবস্থা।

ছবিরাণী যেন শেষ করে দিয়েছে সহ্যের যেটুকু সীমা ছিল। প্রাণের জ্বালা বাড়তে বাড়তে ভয়ানক একটা কিছু করে ফেলার এমন জোরালো তাগিদ সে ভিতরে অনুভব করে যে নরেন বুঝতে পারে, ভদ্র আত্মীয়বন্ধুর এই পরিবেশে থাকলে তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের এই সমাজের খাপ খাওয়া একেবারেই অসম্ভব তার পক্ষে। প্রতিদিন অপমান সইতে সইতে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ভয়ানক কিছু করে বসা সত্যই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

তাকে পালাতে হবে এই পরিবেশ ছেড়ে।

গরিবদের মধ্যে, অশিক্ষিতদের মধ্যে, চাষি-মজুরদের মধ্যে, পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে !

যারা অন্ধকারে থাকে, শুধু সূর্যের আর চাঁদের আলো চেনে, কৃত্রিম আলোয় মিথ্যার সত্যরূপ দর্শন করে বিভোর হয় না—তাদের মধ্যে যেতে হবে। সেখানে কেউ তো তাকে ঘৃণা করবে না অপমান করবে না সে বেকার বলে ! উসকানি দিয়ে দিয়ে তাকে পাগল করে দেবে না।

উপোস করে থাকলেও স্বস্তি আর আত্মমর্যাদা বোধটা তো তার বজায় থাকবে। অন্তত মাথাটা ঠিক রাখতে তো পারবে ওদের সঙ্গে থেকে।

মণ্টুর পরীক্ষা শেষ হওয়ামাত্র তল্পিতল্পা গুটিয়ে মানে মানে ভাড়া-গোনা ঘরটা ছেড়ে দিয়ে দীননাথ সপরিবারে তার দেশ-গাঁয়ের ছেড়ে আসা ভিটেয় ফিরে গিয়েছে।

সেখানে তার বড়োভাই প্রাণনাথ আজও টিকে আছে কোনোরকমে।

এই শহরেই অবশ্য তাকে আরেকটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু ঘর ভাড়া দিয়ে একটা মাসও তার সকলকে নিয়ে এখানে থাকবার মুরোদ কই ?

মণ্টুর পরীক্ষার জন্য মাসখানেক কাজ যাবার খবরটা বাড়িতে চেপে রেখেছিল। রোজ সকালে যেন দোকানেই যাচ্ছে আগের মতো এমনিভাবে বেরিয়ে গিয়ে দুপুরে এসে নেয়ে খেয়ে আবার বেরিয়ে গিয়ে রাত করে ঘরে ফিরেছে।

খোঁজ করেছে কাজের।

একমাসে কাজের হদিস মেলেনি। আরও একমাসে যে মিলবে তারই বা নিশ্চয়তা কী ?

তার চেয়ে ওদের সকলকে দেশে ভায়ের কাছে রেখে নিজে একা শহরে ফিরে যেখানে হোক থেকে যা হোক খেয়ে কাজের চেষ্টা চালানোই ভালো।

নরেন বলেছিল, যা বলেছ দীননাথ। সংসারের বোঝা নিয়ে কাজের চেষ্টা পর্যন্ত করা যায় না।

সংসারের জন্যেই তো চেষ্টা। একটা পেটের ভাবনা কেউ ভাবে ? এমনি না জোটে চুরি ডাকাতি খুন জখম করে জেলে গেলেই চুকে গেল। সরকার থেকে খাওয়াবে পরাবে।

খাটিয়ে উশুল করে নেবে।

নিরীহ গোবেচারি দীননাথের গলায় সেদিন প্রথম রাগের আঁচ আর জ্বালার ঝাঁঝ টের পেয়েছিল।

খাটতেই তো চাইছি বাবা। প্রাণপণে খেটে খেটে দুটো পয়সা কামিয়েই তো মরতে চাইছি। সকাল থেকে রাততক খেটে আসিনি অ্যাদ্দিন ? খাটতে চেয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজ ভিক্ষে চেয়ে। জুটছে কই ?

এ ভাষায় না হোক, নন্দনের মুখে কতদিন যে এই কথাই সে শুনেছে এমনি ঝাঁঝালো সুরে !

মন্টু ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। সে নিজেও নাকি ভাবতে পারেনি প্রশ্নপত্রের এত ভালো উত্তর সে দিতে পারবে। এটাই একমাত্র সান্ত্বনা দীননাথের।

সে জন্যই কি নরেনের মতো অত বেশি ঝাঁঝ ফোটে না দীননাথের গলায় ?

নরেন বলেছিল, আমি একবার তোমার দেশের গাঁয়ে যাব ভাবছি—ক-দিন থেকে আসব কিন্তু।

দীননাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, নিশ্চয় নিশ্চয়—সে তো মোদের ভাগ্যের কথা !

চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েও নরেন তার ছেলেকে পড়ানো বন্ধ করেনি, দুবেলা পড়িয়ে তাকে পরীক্ষায় ভালোভাবে উতরে দিয়েছে, এ জন্য দীননাথের কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না।

একেবারে সে কেনা হয়ে গিয়েছিল নরেনের কাছে।

কিছুদিন মন্টুকে ভালো পাস করানোর জন্য বিনা পয়সায় জিদেব বশে পড়িযে কি মায়া জন্মে গেছে নরেনের ?

মন্টুর জন্য নরেনের মন কেমন করে।

অন্যকথাও সে ভাবে।

দোকানেব সামান্য চাকরি যেতেই দীননাথ দেশে পালিয়ে গেল—গাঁয়ের ভিটেয়। ওই গ্রামে একপুরুষ আগে তাদেরও ভিটা ছিল।

একবার গেলে দোষ কী ?

শহরে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চেষ্টা করেও কিছু হচ্ছে না, একটা বেয়ারার কাজ করে যে হাতখরচটা জুটিয়ে নেবে সে উপায় পর্যন্ত তার নেই। গ্রামাঞ্চলে গিযে একবার করে দেখলে হয় না জীবিকার সন্ধান ?

দীননাথ বলেছিল, গাঁয়ের মাধ্যমিক স্কুলটা হাইস্কুলে পরিণত হচ্ছে—নতুন কয়েকজন শিক্ষক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখলে দোষ কী ?

শিক্ষকতা না জোটে, চাষবাসের কাজ করতে পারে কিনা পরীক্ষা করে দেখবে।

নয় চাষিই সে বনে যাবে।

ছবিরাণীর দায় তো আর নেই !

কিন্তু হায় রে বেকারের কপাল ! গরিবদের মধ্যে গিয়ে একটা মাস গরিব হয়ে কাটাতে গেলে সামান্য যা পয়সা লাগে, তাও তার নেই।

আমায় পাঁচটা টাকা দেবেন ?

সোজা জবাব আসে, না। টাকা নেই।

তারপর আসে তাকে পাঁচটা টাকা দিতে না পারার বাস্তব তিক্ত ব্যাখ্যা—এগারো টাকার মতো আছে। কাল সাড়ে-সাত টাকার মতো রেশন আনতে হবে। তোমায় পাঁচ টাকা দিলে রেশন আনা যাবে না।

চাকরি খুইয়েও মণ্টুকে সে পড়াচ্ছিল বলে আরও বেশি রাগ হয়েছিল বাড়ির সকলের।

ঝাল ঝাড়বার সুযোগ জুটছিল না।

ছেলেপড়ানোর কাজও কী করতে পার না ? দুটো পয়সা আসে ?

জুটিয়ে দিন না ! একটা বেয়ারার কাজ পেলে এখুনি নিয়ে নিই, টিউশনি খুঁজছি না ভাবছেন ?

তারিণী তখন আর কিছু বলেনি।

ছেলেব চাকরির জন্য সে-ও প্রাণপণে চেষ্টা শুরু কবেছিল, এবার একটা টিউশনি জুটিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল।

রবিবার সকালে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেই তারিণী বলে, ভূপেশবাবুকে ধরেছিলাম, উনি তোমায় রাখতে রাজি হয়েছেন। সকাল বিকাল এক ঘণ্টা করে ছেলে আর মেয়েকে পড়াবে। ওঁর সঙ্গে আজকেই দেখা করে কথা বলে সব ঠিক করে আসবে।

কত দেবেন ?

পনেরো টাকা ?

দু-বেলা পড়িয়ে পনেরো টাকা ?

ছোটো ছেলেমেয়ে তো—নীচের ক্লাসে পড়ে। ওর বেশি দেবে না। এখন এতেই লেগে যাও, আরেকটা তো খুঁজতেই হবে।

ভূপেশবাবুর না মাস্টার ছিল ?

ওকে রাখবেন না।

ভূপেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তাকে ওই প্রশ্ন করলে সে বলে, হ্যাঁ, মাস্টার আছে—ভালো পড়ায় না। দশ টাকায় পড়াচ্ছিল—আই এ ফেল। আমি ভাবলাম পাঁচ টাকা বাড়িয়েই দি, পাস করা একজন ওদের পড়াক।

মনটা খুঁতখুঁত করে নরেনের। তাব জন্য একজনের কাজ যাবে !

সে-ও হয়তো তারই মতো বেকার। হয়তো এই দশটা টাকার টিউশনিটাই তার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু সে কাজটা না নিলে কি কোনো উপকার হবে ও বেচারার ? ভূপেশ পাস করা মাস্টার চায়। আরেকজন পাস করা বেকারকে সস্তায় পেলেই ভূপেশ ওকে বিদায় করে দেবে।

হরিপদ তার আসন্ন বিপদের খবর পায় তার ছেলেমানুষ ছাত্রছাত্রীর কাছে। বাড়িতে মাস্টার বদলের আলোচনা শুনে তাদের মন খারাপ হয়ে গেছে। ন-বছরের উমা বলে, আপনিই থাকুন মাস্টারমশাই ? আপনার কাছে পড়তে ভালো লাগে।

তোমার বাবা না রাখলে কী করে থাকব ?

তারা ম্লানমুখে ছলছল চোখে চেয়ে থাকে !

রাত্রে হরিপদ নরেনের কাছে যায়। কোনো ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে, এটা কী আপনার উচিত হচ্ছে দাদা ? নিজেকে নিচু করে একজনের চাকরি খাওয়া ?

হরিপদর বয়স তার চেয়ে অনেক কম। বোধ হয় দু-একবছরের মধ্যেই আই এ ফেল করে পড়া ছাড়তে হয়েছে।

নরেন বলে, আমার কী দোষ বলো ? ছেলেমেয়ের জন্য ভূপেশবাবু বি এ পাস মাস্টার চান।

চান বলেই আপনি যাবেন ? গ্র্যাজুয়েট হয়ে পনেরো টাকায় দুবেলা পড়াতে রাজি হয়ে আমার চাকরিটা খাবেন ? উচিতমতো বেতন দিত, আপনি পড়াতেন, আমার কিছু বলার থাকত না। আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়েও এত সস্তায় যাচ্ছেন বলেই তো আমাকে তাড়াচ্ছে।

তুমিও তো সস্তায় পড়াচ্ছ—দশ টাকায় দুবেলা।

আমার বয়স কম, আই এ ফেল করেছি, আমার কথা আলাদা। আপনার মতো কোয়ালিফিকেশন থাকলে আমি তিরিশের এক পয়সা কমে দুবেলা পড়াতে রাজি হতাম মনে করেছেন ?

এ কথার লাগসই জবাব নরেন খুঁজে পায় না। সত্যই সে নিজেকে সস্তা করেছে। বি এ পাস করে দুবেলা পনেরো টাকায় ছেলে পড়ানো সত্যই অপমানের কথা। কিন্তু তার যে উপায় নেই।

সে তাই বলে, সে নয় বুঝলাম। কিন্তু আমি রাজি না হলে তোমার কী লাভ আছে কিছু ? ভূপেশবাবু আরেকজনকে নেবেন।

হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে বলে, কেউ রাজি হবে না। এমনিতেই তো অল্প মাইনে দেয়, কিন্তু তারও তো একটা মোটামুটি রেট আছে—কীরকম মাস্টারকে কত দিতে হবে ? আপনি পনেরো টাকায় দুবেলা পড়াচ্ছেন জানলে পাড়ার যত বাড়িতে মাস্টার আছে তারা আপনাকে গালাগালি দেবে না ?

একটু থেমে হরিপদ আবার বলে, আপনারও তো একটু আত্মসম্মান বোধ আছে !

আছে কী আত্মসম্মান ?

তার মতো অবস্থার বেকাবের কী আত্মসম্মান থাকে ? না থাকা উচিত ?

হরিপদব ওই কথাটাই তাব বারবার মনে পড়ে—যতই সামান্য হোক গৃহশিক্ষকদেব বেতন—তারও একটা মোটামুটি মান বাঁধা আছে, তার কমে কেউ ছেলে পড়ায় না।

এ নিয়ম ভাঙলে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে পাড়ার মাস্টারবা তাকে টিটকাবি দেবে, গালাগালি করবে !

এত অন্যায়-অবিচারের মধ্যেও তবে নিযম ও নীতি আছে ?

নরেন ভাবে। ইতস্তত করে।

একটু ইতস্তত করেই তার মাথায চড়ে যায আগুন। নিজেকে সে ধিক্কার দেয়।

সে না মরিয়া হয়ে ভয়ানক কিছু করে ফেলার কথা ভাবে ? জেলে যাবার কথা ভাবে ? এই কী তার নমুনা ! এই সামান্য একটা বিষয়ে মনস্থির করতে, মনটা শক্ত করতে, তাকে এত ভাবতে হয়।

আগে সে যায় ভূপেশের কাছে। জানিয়ে দেয় পনেবো টাকায় সে দুবেলা তার ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারবে না।

ভূপেশ বলে, এই রাজি হয়ে গেলে—এই আবার বলছ পারবে না ? একটা কথারও কি ঠিক থাকে না তোমাদের ?

এত সস্তায় কিনতে চাইলে কী করে কথা ঠিক রাখি বলুন ? সস্তা মানুষের কথা সস্তা হবে না ?

বাড়ি ফিরেই সে তারিণীকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

তারিণী রেগে বলে, পনেরো টাকা ! পনেরো টাকাই বা তোমাকে দিচ্ছে কে শুনি ? বিড়ি কেনার পয়সা তোমাকে হাত পেতে চেয়ে নিতে হয় মনে থাকে না ?

আর চাইব না।

তারিণীর গলা চড়ে যায়।

চাকরি জুটিয়ে দিলে যে চাকরি রাখতে পারে না, একপয়সা যার রোজগার করার ক্ষমতা নেই—

নরেনেরও গলা চড়ে।

ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। আমাকে রোজগার করতে না দিলে কী করব ?

সূচনা দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল, আজ প্রলয় ঘটে যাবে বাপ-ব্যাটার মধ্যে। কিন্তু নরেন বেশি দূর গড়াতে দেয় না ঝগড়াটা, কথা-কাটাকাটি কুৎসিত গালাগালিতে পরিণত হয়ে ওঠার আগেই সে ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

শান্ত ও সংযত হয়ে বলে, আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। চাকরি জোটাতে পারলে ফিরব কিনা বিবেচনা করা যাবে।

ছেলের আকস্মিক দিক পরিবর্তনে এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণায় তারিণী প্রথমটা থতোমতো খেয়ে যায়।

তারপরেই গর্জে ওঠে, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড ! নিশ্চয় তুই কোথাও চাকরি জুটিয়েছিস। নইলে কাল টিউশনি নিবি ঠিক করে আজ মত পালটাস—বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি বলিস !

চাকরি জুটিয়েছি ? যেমন হোক একটা চাকরি জোটাতে পারলে তো সব হাঙ্গামা চুকেই যেত !

কিছু একটা না জুটে থাকলে কোন সাহসে তুই বাড়ি ছাড়ার কথা বলিস ? কোথায় থাকবি, কী খাবি ?

নরেন বলে, আপনার এখানে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভালো। কেন আমি চলে যাচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখবেন।

সেদিন জামাই অশোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে তারিণী যেভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিল আজও ঠিক সেই রকম আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে, আমি কী করেছি তোর, যে বুড়ো বয়সে আমায় শাস্তি দিচ্ছিস ? চাকরি খুইয়েছিস বলে খেতে পরতে দিই না তোকে ? হাতখরচা দিই না ? তোর জন্যে চাকরির চেষ্টায় দিনরাত—

তারিণী হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে !

নরেন নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে।

যথারীতি সকলেই এসে জুটেছিল, এতক্ষণ কেউ কথা কইতে সাহস পায়নি।

এবার মা বলে, তুই বড়ো নিষ্ঠুর নরেন। বকাঝকা যদি দিয়ে থাকে, তোর ভালোর জন্যই কী দেয়নি ?

তারিণীর কান্না নরেনকে আরও শান্ত, আরও সংযত করে দিয়েছিল।

সে বলে, তা দিয়েছে বইকী ! বাপ যে ছেলের মন্দ চায় না, আমি তা জানি। কিন্তু এ রকম অবুঝের মতো ভালো চাওয়ার রকমটা এবার বদলাতে হবে। বুঝে শুনে ভালো চাইতে হবে। ছেলের যেটা দোষ নয় বরং গুণের কথা সে জন্য ছেলেকে দোষী করা চলবে না, গালমন্দ করা চলবে না।

উষা মুখ বাঁকায়। যার সোজা মানে এই যে, একটা কাজ জুটোবার মুরোদ না থাকলেই লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ার মুরোদ হয় মানুষের !

কিন্তু মুখ যে সে বাঁকায় নিছক অভ্যাসের বশে, নরেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে শুনে সে-ও যে রীতিমতো ভড়কে গেছে, সেটা বোঝা যায় তার কথা শুনে।

সে বলে, সেকেলে বি এ পাস মুখ্যু বাপ নয় কিছুই বোঝে না, একেলে বি এ পাস পণ্ডিত ছেলের উচিত তো তাকে বুঝিয়ে দেওয়া ! আমারও মনে হচ্ছে তুমি যেন ঠিক কথাই বলছ। কিন্তু মনে হলেই তো হবে না ! ভালো করে একটু বুঝিয়ে না দিলে কী বলছ তা তো বুঝতে পারবে না ! জগৎসংসার পালটে গেছে সবাই এটা জানে। মা-বাবা যে রোজ দশবার বলে এটা ঘোর কলিযুগ—তার মানে তো কই বোঝ না তুমি ? মা-বাবা তো বলছেই যে আগের যুগ নেই, নতুন যুগ হয়েছে। মুখ্যু মা-বাপকে তো বুঝিয়ে দেবে এটা কলিযুগ নয়, নতুন যুগ, সত্যযুগের চেয়ে ভালো যুগ ? বুঝিয়ে

বলার মুরোদ নেই নিজের কথা, রাগ করে বাড়ি ছেড়ে মা-বাপের মনে কষ্ট দেবার গোঁয়ার্তুমি আছে ষোলোআনা।

বোনের তিরস্কারে নরেন মাথা হেঁট করে না, স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ছেলেমানুষ বোনটার সহজ সমালোচনায় তার আত্মসমালোচনার সংকীর্ণতা ও অসার্থকতা যেন ধরা পড়ে গিয়েছে তার কাছে।

উষা যে রোজ দুপুরে তমালের ঘরে সমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যায়, কারও পেটে স্কুলের সামান্য বিদ্যা ছাড়া বেশি কিছু না থাকলেও তারা যে জীবন ও জগতের নানাবিষয় নিয়ে এলোমেলো উলটো-পালটা কথা বলাবলির মধ্যে নিজেরা বুঝবার চেষ্টা করে, নতুন যুগের বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি—এটা একেবারেই জানা ছিল না নরেনের।

জানা থাকলে সে বুঝতে পারত উষার পক্ষে কী করে সম্ভব হল মেয়েলি লেকচার ঝেড়ে তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

ভাবনাচিন্তা করার সময় ছিল না। নরেন হৃদয়ের নির্দেশ মেনে নিয়ে উষাকে বলে, আমি রাগ করে চলে যাচ্ছি না। রাগ তোরাই করিস, বুঝবার চেষ্টা করিস না।

রাগ না হলে চলে যাচ্ছ কেন ? তোমায় তো কেউ তাড়িয়ে দেয়নি বাড়ি থেকে ?

এ অবস্থায় বাড়িতে থাকা উচিত নয় বলে চলে যাচ্ছি। রাগ হলে শুধু ঝগড়া করেই চলে যেতাম। চাকরি তো আমি একলা করছিলাম না, অন্য যারা করছিল তাদেরও মা-বাপ ভাইবোন আছে। নিজের কথা ভাবতে গেলেই ওদের কথা ভাবতে হবে। একজন ছাঁটাই হলে যদি আমরা সবাই চুপচাপ থাকি—তার মানে কী দাঁড়ায় জানিস ? যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ছাঁটাই কর, আমরা যারা ছাঁটাই হইনি তারা সবাই চুপ করে থাকব। এটা কী মানা যায় ? সহ্য করা যায় ?

একজনকে বিনা দোষে ছাঁটাই করলে তাই আমরা সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করলাম—তেরোজন ছাঁটাই হলাম। তোমাদের বুঝতে হবে, মানতে হবে, এটা আমার দোষ নয়—গুণ। এটা আমার বোকামির পরিচয় নয়, বুদ্ধির প্রমাণ !

তারিণীর কান্না থেমে গিয়েছিল নরেনের মা মুখ খুলতেই। কান পেতে সে শুনছিল মেয়ে ও ছেলের কথা।

এবার সে মুখ খোলে, একজন ছাঁটাই হলে—

বিনা দোষে ছাঁটাই হলে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথাই বলছি আমি। একজন বিনা দোষে ছাঁটাই হলে হাঙ্গামা করাটা তোমরা ভালো ভেবেছ—আর কাউকে ছাঁটাই করতে সাহস পাবে না। কিন্তু একজনের ছাঁটাই ঠেকাতে তোমরা তেরোজন যে ছাঁটাই হয়েছ, কিছু করতে পেরেছ সে জন্য ? ঘরের ভাত খেয়ে খেয়ে তেড়িবেড়ি করা ছাড়া ?

অজ্ঞতাটা প্রকাশ পায় তারিণীরই কিন্তু সে জন্য নরেন নিজে লজ্জা বোধ করে। সে শুধু ঝগড়াই করেছে বাপের সঙ্গে যে, সে একলা নয়, আরও তেরোজন চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েছে তার সঙ্গে—এ আরেকটা খবর বাপকে জানানো সে দরকার মনে করেনি যে তেরোজনকে বরখাস্ত করার জন্য আজ তিন মাস সাড়ে সাতশো লোকের চাকরি করা বন্ধ। আপিস বন্ধ, কারখানা বন্ধ। তেরোজনকে চাকরি না দিলে কেউ তারা আপিসে চাকরি করবে না কারখানায় খাটবে না—দরকার হলে না খেয়ে মরবে। এ সব কথা কিছুই সে জানায়নি তারিণীকে। ধরে নিয়েছে যে তারিণী সব জানে, সব জেনেও চাকরি হারানোর জন্য তাকে গঞ্জনা দেয়।

নরেনের লজ্জাবোধটা কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে যায় রাগে। কেন তারিণী এমন অজ্ঞ হবে ? এতবড়ো গুরুতর ব্যাপার সম্পর্কে কোনো খবর রাখবে না ?

একটা যেন সুযোগ জুটেছে, অজুহাত জুটেছে ঝগড়া করবার।

নরেন ঝিমিয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, রাগ করব না ? সাত-আটশো লোক কাজ বন্ধ করল, আপিস বন্ধ হল, কারখানা বন্ধ হল,—বাবা খালি বলছেন, তুই কেন চাকরি হারালি। ওদের সঙ্গেই তো চাকরি করব আমি ? না একলা সকলের বিপক্ষে দাঁড়াব ?

তারিণী বলে,—এ কথাটা তো তুমি বাপু জানাওনি আমায় ! তোমার চাকরি যাবার পর তিন-চারবার তোমার আপিসে গিয়েছি দেখেছি দিব্যি সবাই চাকবি করছে।

কিছুদিন সময় লাগবে না ? স্ট্রাইক হয়েছে পরের মাসে পয়লা থেকে।

মা বলে, যাক গে যাক, ও সব বোঝাপড়ার ব্যাপার যাক। তুই বাপু মাথা ঠান্ডা রাখো।

মাথা ঠান্ডা বাখার জন্যেই আমি আজ চলে যাচ্ছি।

আর আসবি না ?

আসব বইকী !

উষা বলে, একটু সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলো না কোথায় যাবে, কী করতে যাবে ?

তিলককণ্ঠী আর গেরুয়া কাপড় পরা অর্ধউলঙ্গ ঠাকুর্দার তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে উদাসভাবে নরেন বলে, চাকরির চেষ্টায় মাসখানেক ঘুরে বেড়াব ভাবছিলাম। তারপর সে সোজাসুজি তারিণীকে বলে, আমায় পাঁচটা টাকা দেবেন ?

চাকরির চেষ্টায় বেরোবে ? দাঁড়াও, দেখি।

পাঁচটা টাকা চেয়েছিল, দশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দেয়।

বলে, সাবধানে থেকো, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে কুশল দিযো।

পোস্টকার্ডে কুশল দিতে বলার মানেই পোস্টকার্ড আর খামের দামের তফাতকে মর্যাদা দেওয়া।

দীননাথের দাদার নাম প্রাণনাথ। মা-বাবা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসত। কিন্তু সে জন্য বোধ হয় নয়। তারা কী আব জানত যে ছেলেকে তারা প্রাণেব চেয়ে ভালোবাসে ? বিদ্যাসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভাগের প্রায় তিন ভাগ বিদ্যা ছেলেবেলা পেটে গিয়েছিল বলেই বোধ হয় যাদব ছেলের জিভ জব্দ করা, দাঁতভাঙা নাম বেখেছিল প্রাণনাথ—যদু, মধু, পাঁচু, হাঁদা ইত্যাদি এত সহজ সহজ নাম রাখবার প্রথাটা চালু থাকতেও।

বাপের বিদ্যা ফলানো কোনো কাজেই লাগেনি প্রাণনাথেব। কেউ ভুলেও তাকে প্রাণনাথ বলে ডাকে না। নিজেও সে এক রকম ভুলে গেছে তাব ও রকম একটা ভালো নাম, আসল নাম, দেওয়া হয়েছিল।

সবাই তাকে পরাণ বলেই ডেকে আসছে চিরকাল। সেই দুঃখেই কি প্রাণনাথ নিজের ছেলের আরও বেশি জমকালো নামকরণ করেছিল—জগদীশ্বর ? কিন্তু সেও দশজনের কাছে এবং নিজের কাছে পরিচিত হয়ে আছে জগা নামে !

পরাণ রোগে শয্যা নিলে তেরো বছর বয়সে নাথুপুরের কারখানার বাতি লণ্ঠনে লাগাবার কাজে ভর্তি হবার সময় সে নিজেই নিজের নাম দাখিল করে—জগা !

নাম কী লিখব রে ?

জগা লেখেন।

আরে শূয়ার, তোর নাম জগা তা জানি। পদবিটা বল ?

পদবি— ? পদবি ? পদবি লেখেন গুঁই।

নিজের জগদীশ্বর নামটা ঘোষণা না করে সে বোধ হয় মোটা কালো প্রণবেশ্বরের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

ভবেশ্বরবাবুর সুপারিশে রং মাখার কাজে অ্যাপ্রেন্টিস ভর্তি হতে এসে সে যদি বলত যে নাম তার জগদীশ্বর গুঁই, প্রণবেশ্বর চক্রবর্তী বোধ হয় হাসির চোটে ভুঁড়ি ফেটে মারা যেত।

বাড়িতে ঢুকে সবার আগে নরেনের চোখে পড়ে পরাণের একলা থাকার খুপরি ঘরটা।

সমস্ত বাড়িটা সকলকে ছেড়ে দিয়ে সে গোয়ালঘরের কোনায় হাত দুই চওড়া হাত পাঁচেক লম্বা এই খুপরিটা বানিয়েছে।

সারাদিন সে ওখানে পড়ে থাকে।

মাঠে গিয়ে চাষবাসের কাজ করার তার ক্ষমতা নেই। কোনো কাজ করারই ক্ষমতা নেই।

দুটি হাতই তার আধখানা করে কাটা। তেভাগাব হাঙ্গামার সময় ওই দুহাতে লাঠি ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে যাবার ফল।

তার ওই দিবারাত্রি থাকার খুপরিতে তিনটে কাঠের তাক।

উপরের তাকে ছোটোবড়ো নানাআকারের মাটির ভাঁড় আর সরা—চুন কালি আর ওই রকম সাধারণ ঘরোয়া রং দিয়ে বিচিত্র রকমে চিত্রিত করা। হাত থাকতে পরাণ নিজের হাতে এগুলি চিত্রিত করেছিল। প্রত্যেকটি ভাঁড় আর সরার গায়ে যেন তার চাষাড়ে মোটা হাতের স্মৃতিচিহ্নের আলপনা আঁকা।

মাঝের তাকে কয়েকটা বই আর পুঁথি। বই বলতে বাপের আমলের রামায়ণ মহাভারত আর ব্রতকথা পাঁচালির প্যামফ্লেট। সবগুলিই জীর্ণ পুরানো হয়ে গেছে। চাঁপা নিয়মিতভাবে পাড়ার মেয়েদের এইগুলি পড়ে শোনায় বলেই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশবছর বইগুলি টিকে আছে।

যে সব বই ঘাঁটাঘাঁটি হয় সে সব বইতে উই ধরে না !

নীচের তাকে কিছুই নেই।

শুধু সিঁদুর লেপা একটি ফটো। আস্ত বাতাসা একটাও নেই, ধুলোর মতো একটুখানি বাতাসার গুড়ো। দু-একটা সস্তা জবা গাঁদা শিউলি ফুল।

এই তাকের সামনে যোগাসনে বসে পরাণ রোজ সকালে বিকালে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে দু-একটা পুঁথি নিয়ে পড়ে।

বাড়ির লোক তাকে খেতে ডাকতে সাহস পায় না।

কে জানে ? হয়তো ধ্যানভঙ্গ হলে পরাণ খেঁকিয়ে উঠবে।

কোথাও কিছু নেই পরাণ গর্জন করে ওঠে, একছিলুম তামাকও তোরা দিতে পারিস না ?

হয়তো বেলা দুপুর, পেটে খিদে নিয়ে ভাতের বদলে পরাণ তামাক চায়। বাড়ির লোকে তার ধাত জানে—খাওয়ার কথা না বলে তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দেয়।

জগা বা চাঁপারা নরেনকে চিনতে পারে না। কিন্তু নরেনকে দেখেই পরাণ বলে, চিনেছি গো, চিনেছি। জগা তুমাকে চিনলে না ? তা চেনাচিনির কারবার তো চুকিয়ে দিয়েছে তুমার বাবার বাবা, তিরিশ বছর আগে। তুমি হঠাৎ এলে কেন ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরছে বাবা।

দীননাথ বলে, মন্টুকে পড়াতেন, একবার আসবেন বলেছিলেন।

পরাণ হাসে।

মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পনেরো-বিশদিন কামায়নি—মাসে একবারই সে কামায়।

তবু সমস্ত মুখটাই যেন তার হাসে।

এসেছ বেশ করেছ। হাজারবার এসবে। বড়ো দুরবস্থা কিনা তাই বলছিলাম কী, তেমন আদর খাতির চেয়ো না কিন্তু। সে দিনকাল নেই। ঠাকুদ্দা ফি বছর দশসেরি বুই দারোগাবাবুকে নজর দিত। বিল পুকুরে দুসেরি একটা মাছ মেলে না আজকাল।

দারোগাবাবুকে নজর দিতেও হয় না তো আজকাল।

হয় না ? আগে ছিলেন দারোগাবাবু, আজকাল কত রকমের কত যে বাবু হচ্ছেন ঠিকানা আছে ? তবে হ্যাঁ, সবার জন্যে দশসেরি রুই লাগে না।

মুখে যাই বলুক, পরাণ যথাসাধ্য অতিথিকে সমাদর করার আয়োজন আরম্ভ করে—অসাধ্য-সাধনের চেষ্টাও করে।

নরেনের বাবা যখন বছরে পূজাপার্বণ উপলক্ষে অন্তত কয়েক দিনের জন্য দেশের বাড়িতে আসার প্রথাটা পালন করে চলত, তখনও পরাণের যে পরিমাণ জমি ছিল, আজ তার সিকিও নাই ! যে পরিমাণ জমি ভাগে নিয়ে চষত, আজ তার সিকিভাগ পায় না।

জমি নিয়ে নিয়েছে বর্গাদার। অর্ধেকের বেশি নিজে খেতমজুর দিয়ে চাষ করায়।

কিন্তু তারিণীর ছেলে দুদিনের জন্য বাড়িতে এসেছে। খেয়ালের বশেই আসুক আর যে জন্যই আসুক, দরকার হলে বাড়ির সকলের দু-চারদিন উপোস করেও তাকে খানিকটা সমাদর করতে হবে।

নরেন টের পেয়েই ঝোলানো থলিতে সামান্য তল্পিতল্পা গুটিয়ে, সুজনিটা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে বলে, আমি বাবু বিদায় হলাম।

পরাণের মেজোছেলে জেল খাটছে জমির ব্যাপার নিয়ে জমিদারের গুন্ডা লেঠেল আর পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করার অপরাধে।

জগা অতিকষ্টে সামলে গেছে।

জগা বাঁশের লাঠিটা বাগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে একগাল হেসে বলে, বললেই হল বিদেয় হলাম ? অপরাধটা কী করেছি বলতে হবে তো ? চাষাভুসো মানুষ—মুশকিলে মুশকিলে মাথা-টাথা তায় আবার গুলিয়ে আছে। তা, বুঝিয়ে বললেও কী বুঝব না, ঘাট হল কীসে ?

নরেন বলে, ঘাট বইকী ! বাপদাদার ভিটে দখল নিয়েছে জ্ঞাতি খুড়োরা, তাই বলে গিয়ে উঠলে কী আদরযত্ন কম করত ? মাছ দুধ কম খাওয়াত ? পরাণ খুড়োর ঘরে কেন উঠলাম যদি না বুঝে থাক—

বলতে বলতে নরেনের খেয়াল হয় সে ভাষা ভুলে গেছে,—গেঁয়ো আর গরিব বিপন্ন চাষিদের সঙ্গে কথা বলার ভাষা !

সে বোঝে, জগার তেল পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি বাগিয়ে রুখে দাঁড়ানোটা খাতিরেরই একটা প্রতীক, গটগট করে চলে গেলে সত্যসত্যই কী আর সে মাথায় তার লাঠি বসিয়ে দেবে অপমানে !

হয়তো নিজের মাথাতেই লাঠির একটা ঘা বসিয়ে বলবে, ধেত, মোদের জম্মো বৃথা ! যদি বা এল এ জনা, মন বুঝে রইতে দেবার বুদ্ধিটুকু ঘটে গজাল না। অবমান হয়ে রেগে চলে গেল !

সে বোঝে। কিন্তু জগা যেমন মিছামিছি লাঠি বাগিয়ে ধরে হাসিমুখে পরিষ্কার করে বুঝিয়েছে তার কথা, সে কিন্তু নিজের মিছামিছি থলি গুছিয়ে বিদায় নিতে চাওয়ায় আসল মানেটা ওকে বোঝাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না !

গেঁয়ো হোক অসভ্য হোক সমস্ত পরিবারের পক্ষ নিয়ে জগার এই প্রতিবাদের কোনো সরল সহজ জবাব খুঁজে না পেয়ে অগত্যা সে কাব্যিক ভাষা আশ্রয় করে।

মেয়েরা পর্যন্ত খিড়কিতে গোয়ালে শূন্য জীর্ণ ধান বোঝাই করার পুরানো গোলাটার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে, চেয়ে আছে স্থির উৎসুক দৃষ্টিতে। তাদেরও যেন জিজ্ঞাসা : শহর থেকে হঠাৎ আপন হয়ে কেন এলে বাবু ? আপন করতে চাইলাম বলেই রাগ করে কেন চলে যাচ্ছ।

দীননাথ বা মন্টু মুখ খোলে না, একটি কথা বলে না। এখন মুখ না খোলাই সব চেয়ে ভালো পন্থা !

কাব্য ছাড়া গতি নেই।

নরেন বলে, প্রাণে বড়ো আঘাত লেগেছে জগাদাদা।

জগাদাদা !

চাষি মেয়েপুরুষ ক-টা চমকে ওঠে !

জগা হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফাঁকা গোয়ালটার দিকে। মুখের হাসিটা সে আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেভানোর মতো !

হাতজোড় করে বলে, কী অপরাধটা হল মোদের ?

নরেন তখন হিসাবনিকাশ কাব্য-কবিতা সব ভুলে বলে ওঠে, হাতজোড় করছ কেন ? তামাশা করছ কেন ? আমি কী দারোগা না নায়েববাবুর পেয়াদা এসেছি তোমাদের ঘরে ? একটু প্রাণের জ্বালা জুড়োতে এলাম তোমাদের কাছে, তোমরা খালি দূর দূর করছ—বাবু এয়েছেন, বাবুকে খাতির কর—শহরের বাবু এয়েছেন, বাবুকে খাতির কর। আমি এলাম একভাবে—

নরেন থেমে যায়। সে কেন এসেছে, কী ভেবে এসেছে, কী চেয়ে এসেছে এদের বোঝানো কি সম্ভব তার পক্ষে ?

কিন্তু তার নিরুপায় প্রাণের জ্বালার ভাষাটা বুঝে যায় সকলেই।

জগা হাত চেপে ধরে নরেনের।

বলে, ভাই, হঠাৎ কেন আসেন, হঠাৎ কী বলেন, বুঝে উঠতে পারি কী ? কেউ পারে ? জীবন মরণ সমস্যা দাঁড়িয়েছে—পাঁচ-দশবছর বাদে মোরা শেষ হয়ে যাব কি না কে জানে, বলেন ?

পরাণ বলে, জগা, বাবুকে যেতে দে। শহরে ফিরে গিয়ে যা খুশি বলুন মোদের নামে। গেরাহ্য করি নে কো।

জগা গর্জন করে ওঠে, চুপ করো দিকি বোকাহাবা ? জমিগুলো খইয়ে দিলে বাবুদের সাথে ভালোমানষি করে। কিছু বুঝবে না। শুনবে না, ফপরদালালি করে সব গোল্লায় দেবে।

পরাণ দমে যায়। ছেলের কাছে এমন ধমক—তাও আবার দীননাথের সামনে তারিণীর ছেলের সামনে !

উঠানে নেমে এসে সে সবিনয়ে নরেনকে বলে, যাবেন কেন, থাকেন না ? কষ্ট পাবেন, তবু থেকে যান। মোরা কী অবস্থায় আছি—

জগা ধমকের সুরে বলে ওঠে, চুপ করো দিকি। মোরা কী অবস্থায় আছি জানতে কী এসেছেন ? বাবু জ্বলছেন নিজের প্রাণের জ্বালায়। একটু জুড়োতে এসেছেন মোদের কাছে। তুমি শুরু করে দিলে নিজের গাউনি।

নিজে তার কাঁধ থেকে তল্পিতল্পার থলিটা নামিয়ে নিয়ে, হাত ধরে তাকে দাওয়ার দিকে নিয়ে যেতে যেতে জগা হাঁক ছাড়ে—চাটাইটা দাওয়ায় বিছিয়ে দাও কেউ !

চাটাইয়ে বসে নরেন শান্তগলায় বলে, তুমি ভাই ধরেছ ঠিক। প্রাণের জ্বালা জুড়োতেই এসেছি। তা দেখছি কী, তোমাদের প্রাণেও জ্বালা বড়ো কম নয়।

জগা মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

জগার বউ চারু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কথাগুলি শোনার জন্যই দুয়ারের কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ঘোমটার আধঢাকা মুখ তুলে সে নরেনের দিকে একবার তাকায়। ঘোমটা একটু টেনেছে কিন্তু পরনের কাপড়খানা আর পরবার মতো নেই—কোনোমতে কাজ চালানো।

নরেন আরও কিছু বলে কি না শোনবার জন্যই সে বোধ হয় একটু অপেক্ষা করে।

নরেন যেন নিজের মনেই বলে, ভালোই হল এসে। জ্বালা মেলাতে গিয়ে প্রাণে প্রাণে মিল হবে।

জগা বলে, মিল বরাবর রয়েছে প্রাণের—জ্বালাটা তফাত ধরে নিই বলেই তো এত ভুল বোঝাবুঝি।

তা মন্দ বলনি। তবে পেটের জ্বালা এবার সব জ্বালা একাকার করে দিচ্ছে। তোমার পেট আমার পেট একভাবেই জ্বলে কিনা। প্রাণের জ্বালাও একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। কিন্তু শাকভাত তারা আধপেটা খাক, অতিথিকে তো পেট ভরে খেতে দিতে হবে !

সামান্য আয়োজনে যত্নের বহরটা নরেনকে বুঝিয়ে দেয়, একদিনের সম্পন্ন চাষি পরাণের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে।

তার একার নয়। চাষি সমাজের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে বুঝতে একবেলাও সময় লাগে না নরেনের।

নাথুপুরের নিচু স্কুলটা উঁচু স্কুলে পরিণত হতে চলেছে বটে, নতুন বছর শুরু হতেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া শুরু হবে বটে এবং সে জন্য কয়েকজন নতুন শিক্ষকও দরকার হবে বটে—কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায় নরেনের ভাগ্যে এই স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ জুটবে না।

নাথুপুর এবং আশেপাশের গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদেরই কেবল এই স্কুলে চাকরি দেওয়া হবে—আগামী স্কুলের বর্তমান অস্থায়ী স্কুল কমিটিতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিকাংশ পদের জন্য নামও স্থির হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সুতরাং নরেনের দরখাস্ত করে কোনো লাভ নেই।

মালতী বলে, দ্যাখেন কেমন জব্দ হলেন। শহর ছেড়ে গাঁয়ে এসেছেন চাকরি খুঁজতে !

জগা বলে, চাকরি খুঁজতে নয়—প্রাণের জ্বালা জুড়োতে।

মালতী বলে, চাকরি পেলেই জ্বালা জুড়োয় !

গাঁয়ে এসে মালতী তাজা হয়নি, অসুস্থতার ছাপটা তেমনই বজায় আছে তার মুখে—কিন্তু এখানে এসে তার মুখ খুলেছে। মন্টুকে পড়াতে তাদের শহরের বাসার মধ্যে নরেনের রোজ অনেকক্ষণ সময় কাটত, মাঝে মাঝে ছোটো ভাইবোনগুলিকে ধমকানো ছাড়া মালতীর মুখে কোনো কথা শুনেছে বলে সে মনে করতে পারে না।

এখানে মালতী নিজে থেকে যেচে এ বিষয়ে ও বিষয়ে—সহজভাবে নানাকথা কয়। শহরে মূক হয়ে ছিল, গাঁয়ে এসেই সে যেন মনের ভাব প্রকাশ করায় ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

দীননাথ আর মন্টু হয়ে গেছে চুপচাপ !

তার দাদার অবস্থা যে এত বেশি কাহিল হয়ে পড়েছে সপরিবারে এখানে এসে পৌঁছোনোর আগে দীননাথ সেটা অনুমান করতে পারেনি।

এরা নিজেরাই পেট ভরে খেতে পায় না, তার পরিবারটিকে এদের ঘাড়ে বেশি দিন চাপিয়ে রাখা তো সুবিবেচনার কথা হবে না !

পনেরো দিন একমাস ওরা কষ্টকর জীবনযাত্রায় আরও বেশি কষ্ট আমদানি করা সয়ে যাবে কিন্তু বেশি দিন সকলকে ঘাড়ে চাপিয়ে রাখলে অভাবের জ্বালায় পুড়ে যাবে দুটি ভায়ের এবং দুটি ভায়ের পরিবারের মধ্যে এতদিন দূরে বাস করার জন্য বজায় থাকা হৃদ্যতা ও মিল।

এখানে বরাবর একসঙ্গে থেকে চাষবাসের কাজ করে এসেছিল, অন্য কথা—যতই দুঃখদুর্দশা আসুক কারও উপায় থাকত না অপরকে দায়ি করার, সকলেরই হত সমান কর্মভোগ।

কিন্তু নিজের অংশের জমিজমা বেচে দিয়ে ছেলেকে বিদ্বান করতে মানুষ করতে দীননাথ শহরে চলে গিয়েছিল। জমিজমায় কোনো অংশই তার নেই। ভিটেটুকুর অংশে কেবল তার অধিকার।

আজ ওদের এই দুরবস্থার সময় এতগুলি পেটের দায় ঘাড়ে চাপিয়ে ওদের দফা নিকেশ করা চলে না !

দীননাথ চুপচাপ এই সমস্যার কথা ভাবে।

মণ্টুও ভাবে।

দীননাথের ভাবনাচিন্তা সবই ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগিতে করা, ছেলের সঙ্গেই সব ব্যাপার নিয়ে তার শলাপরামর্শ।

দিন তিনেক পরেই দীননাথ বলে, না, বসে থাকা কাজের কথা নয়। মণ্টুকে নিয়ে ফিরেই যাই, কাজকম্মের জোগাড় দেখি।

মণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার একটা কারণ নরেন সহজেই অনুমান করতে পারে—পরাণের বোঝা যতটুকু পারা যায় কম করা। মণ্টু তার সঙ্গে গেলে একটা পেট ভরানোর দায় তো কম হবে পরাণ ও জগার।

মণ্টুকে সঙ্গে নেবার আরেকটা কারণ সে শোনে দীননাথের মুখে। গাঁয়ে বসে জ্যাঠার অন্ন ধ্বংস করে কী লাভ ? পড়াশোনা আর হবে কী হবে না সে তো পরের কথা—পরীক্ষার ফল বেরোলে !

শহরে গিয়ে মণ্টু যদি কিছু রোজগার করতে পারে !

দু-চারপয়সা কামিয়ে কোনোমতে নিজের পেটটা যদি চালিয়ে দিতে পারে তো তাই ঢের।

নরেন ভাবে, কী আশা দীননাথের ! নিজে সে শহরে যাবে কাজের খোঁজে, কোথায় থাকবে কী খাবে, কতদিনে কাজ জুটবে নিজেই সে তা জানে না, তবু সে মণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে যদি সে অন্তত নিজের জীবিকাটা অর্জন করতে পারে !

নরেন বলে, আমিও ক-দিন বাদেই ফিরে যাব।

৬

নরেন নামেই পরাণের অতিথি। একবেলা পাতা পাড়ে তো দুদিন আর সে গরিব বেচারাদের অন্নে ভাগ বসায় না।

পরাণ আর জগাকে বুঝিয়ে বলে, ভেব না তোমরা গরিব বলে ঠকিয়ে চলছি। চাদ্দিকে আত্মীয়কুটুমের বাড়ি ছড়ানো, দেখা করতে গেলে একবেলা না খাইয়ে ছাড়ে না। কতকাল পরে দেশ গাঁয়ে বেড়াতে এসেছি—সকলেই একটু-আধটু যত্ন করতে চায়।

পরাণ বলে, হাঁ, সে ঠিক কথা।

আত্মীয়স্বজন সত্যই আদরযত্ন করতে চায় এবং যথাসাধ্য করেও। নরেনের ভদ্রলোক আত্মীয়স্বজন।

যথাসাধ্য করে !

কিন্তু তাদের অধিকাংশের সাধ্যটা কী পরিমাণ কমে গেছে আঁচ করে নরেন বড়ো দমে যায়। তার নিজের জীবনে যে সমস্যা, যে সংকটের সামনে আজ সে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, শহরের গাদাগাদি করা মানুষের জীবনে যা বিকটরূপে প্রকট—গ্রামাঞ্চলেও তার ব্যাপকতা তাকে বিচলিত করে দেয়।

পোষ্য অনেক। আয় নেই।

অনেকের আবার ধরাবাঁধা কিছুই আয় নেই। ধরাবাঁধা আয় নেই তবু কী করে দিন চলে এ ধাঁধার জবাব শহরে বসে খুঁজে পেত না। এখানে এসে বুঝেছে।

এই সব নিরুপায় আত্মীস্বজনের বাড়ি দেখা করতে গেলে তারা বিব্রত বোধ করেছে তাকে একেবেলা খেতে বলা দূরে থাক—একটু জলখাবারও দেয়নি। দেয়নি মানে দিতে পারেনি।

অন্যদের কারও বাড়ি একবেলা, কারও বাড়ি দু-একদিন থেকে এবং খেয়ে, এক মাসির বাড়ি সাতদিন কাটিয়ে প্রায় একটা মাস নরেন এক রকম বিনা খরচায় পার করে দিল।

মাসির অবস্থা ভালো। আরও কয়েক দিন থাকার জন্য সাধাসাধিও করেছিল। কিন্তু বিনা খরচায় পরের খেয়ে বাঁচার জন্য তো সে দেশে আসেনি !

সকলের দেওয়া আঘাতের সঙ্গে ছবিরাণীর আঘাতের বেদনা ভুলতেও আসেনি।

সে এসেছে মনটা গুছিয়ে নিয়ে শক্ত করতে।

কিন্তু আর পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ নেই।

এবার শহরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

মাসির বাড়ি, ভিন্ন গাঁয়ে। ওখান থেকে সোজা শহরে ফিরে না গিয়ে সে একবেলার জন্য পরাণের বাড়ি পাত পাততে ফিরে আসে।

ওদের কাছে বিদায় না নিয়ে শহরে ফেরা যায় না।

সকালে এসে দুপুরের গাড়ি ধরে কলকাতা রওনা দেবার কথা ভেবে সে আসে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার শহরে ফিরে যাওযা পিছিয়ে যায় আরও পাঁচ দিন।

তার মধ্যে দুদিন কাটে হাজতে।

পরাণের বাড়ি পৌঁছে সে দ্যাখে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—সোজাসুজি তার জন্য না হলেও তাকেও যে ঘটনার একটা উপলক্ষ বলা যায়।

একটা পোস্টকার্ড লিখে সে খবর জানিয়েছিল। তাকে দেবার মতো একদানা চাল পরাণের বাড়িতে নেই। যে চাল কিছু আছে সে চালের ভাত তাকে খেতে দেওয়া যায় না—শহরবাসী একবেলার অতিথির পাতে দেওয়া যায় না।

জমির মালিক শিবরাম জোর করে তাদের ধানও নিজের গোলায় তুলেছিল—এই নিয়ে হয়েছিল বচসা। সেই রাগে শিবরাম আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাদের ধানও আটক করেছে।

তাদের ভাগ তারা আদায় করবে, সে ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ সব ব্যবস্থা তো চটপট হয় না গরিব চাষির ভাগ্যে। অথচ কিছু ধান না হলে এদিকে অতিথিকে অখাদ্য চলের ভাত খাওয়াতে হয়।

কাল সকালে জগা গিয়েছিল কিছু ধান চেয়ে আনতে। সঙ্গে গিয়েছিল দীনু আর হানিফ।

কিছু ধান না হলে তাদের ঘরেও উপোস শুরু হবে দু-একদিনের মধ্যে।

ভাগ নিয়ে কলহের ফয়সালা পরে হবে, আজ তাদের ভাগের ধানের সামান্য একটা অংশ দেওয়া হোক—এই দাবি তারা করেছিল শিবরামের কাছে।

জগা কী করেছিল বাড়ির লোকের জানা নেই। তবে এটুকু তারা অনুমান করতে পেরেছে যে, ধান দিতে নিশ্চয় অস্বীকার করেছিল শিবরাম, জগার মেজাজ নিশ্চয় গরম হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে শিবরামের লোক লাঠি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত জগার জ্ঞান হয়নি।

শিবরামের লোকেরাই তার মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে দীনু আর হানিফের সঙ্গে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

আর দিয়েছে দশ সের ধান।

দীনু আর হানিফকেও দশ সের করে ধান দেওয়া হয়েছে।

শিবরামের লোক বলেছে, জগা নাকি ধান মেপে দেবার পর অতিথির জন্য শিবরামের কাছে দুটি ডাব চেয়েছিল। ডাব পাড়তে গাছে উঠবাব সময় পড়ে গিয়ে জগার মাথা ফেটে গেছে।

হানিফ আর দীনু নাকি ধান নিয়ে খানিক তফাতে চলে গিয়েছিল, ডাক শুনে তারা ফিরে যায়, তারা কিছু দ্যাখেনি।

ঘোষপাড়ার বারো বছরের ছেলেমানুষ গোলক কিন্তু খানিক তফাত থেকে ব্যাপারটা দেখেছে। জগার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল শিবরামের, তার লোক শম্ভু হঠাৎ জগার মাথায় লাঠি বসিয়ে দেয়।

ধান মাপা হয় পরে। জগার মাথা বেঁধে দেওয়ারও পরে।

ঘটনাটা হয় শিবরামের বাড়ির পিছনে পুকুর ধারে—তার নিজস্ব পুকুর। শিবরাম তখন পুকুরে ছিপ ফেলছিল।

জায়গাটা এমন যে, ঘটনাটা বেশি লোকের চোখে পড়া সম্ভব না হলেও গাঁয়ের দু-একজন বয়স্ক লোক যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারা চুপ করে আছে বলে জানা যাচ্ছে না ছেলেমানুষ গোলক ছাড়া আর কে জগার মাথায় লাঠি মারতে দেখেছিল।

গোলক প্রথমে কয়েকজনের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল, তারপর খুব সম্ভব বাড়িতে অথবা শিবরামের লোকের হাতে মারধোর খেয়ে পাংশু বিবর্ণ মুখে সে-ও এখন অস্বীকার করছে নিজের চোখে ঘটনাটা দেখার কথা।

নরেন বলে, দীনু আর হানিফ নিশ্চয কাছে থেকে সব দেখেছে, বলছে কিছু দ্যাখেনি ! ছি ছি ! এত বড়ো অন্যায়টা চাপা পড়ে যাবে !

চাষি আন্দোলনেব পাণ্ডা, বংশী ঘোষাল, জগাব খবব নিতে এসেছিল।

নরেন তাকে বলে, গাছ থেকে পড়েছে না মাথায় লাঠি পড়েছে সেটা তো মাথা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

বংশী বলে, তা যায় বইকী ! সেই জন্যেই তো আসল ডাক্তার আনা। নইলে মাথার ব্যান্ডেজ আমিই বেঁধে দিতে পারতাম।

চাষিরা চুপচাপ সয়ে যাবে ?

তাই কী যায় ? ওর হুঁশ হোক, কী হযেছিল নিজের মুখে সব বলুক, তবে তো বিহিত হবে !

বংশীর এ কথাটার তাৎপর্য তখন নরেন বুঝতে পারেনি—পরে বুঝেছিল।

বংশীর তাড়া ছিল। সে চলে যায়।

পরাণকে বলে যায়, আমি আবার আসব—তার আগে যদি হুঁশ হয়তো খবর দিয়ো।

নরেন বলে, মণ্টু, দীনু আর হানিফের ঘর চিনিস ?

চিনি বইকী !

চল তো আমার সাথে।

নরেন পৌঁছেছিল খুব ভোরে, এখন সকালে সূর্য উঠেছে ডগডগে লাল। চারিদিকে হালকা কুয়াশা। মানুষের মনের টক কষ্টের ছোঁয়াচ লেগে বাতাস যেন দুধের মতো কেটে গেছে। একটা আবর্জনার স্তূপে কাল রাত্রে আগুন দেওয়া হয়েছিল, কটু ধোঁয়াটে গন্ধ চারিদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

গুমরে গুমরে এখনও আগুন জ্বলছে আবর্জনায। ধোঁয়া উঠছে সোজা উপর দিকে, সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে।

রাস্তা ছেড়ে মণ্টু খেতে নেমে যায়। নরেনকে বলে, আল ধরে যেতে পারবেন তো ?

চুপ কর ফাজিল।

খেত ডিঙিয়ে গেলে পথ সংক্ষেপ হবে। মণ্টুর অভ্যাস আছে, পথও তার চেনা, আল ভুল করে শস্যখেতের গোলকধাঁধায় পাক খেয়ে বেড়াতে হবে না। মণ্টুব পিছনে নরেন চলতে থাকে আর ভাবে এর মধ্যেই কোনো জমির টুকবোয় হয়তো জগা ফসল ফলিয়েছিল, যে ধান আজ শিবরামের গোলায়।

দীনুর ঘরের দশা দেখেই টের পাওয়া যায়, কতকাল তাব ঘর ভালো কবে মেরামত করা হয়নি।

দীনুর বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। ভাটা-ধরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, এককালে লাঠিয়াল হিসাবে খ্যাতি ছিল। দশ বছর আগেও নাকি তার অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল, তার আজকের চেহারার ভাটা-ধরা অবস্থা দেখেও সেটা বোঝা যায়।

ডাক শুনে দীনু বাইরে আসে, মণ্টুব সঙ্গে নরেনকে দেখেই সে বিষম রকম ভড়কে যায়। মণ্টুকে সে চেনে, নরেন একেবারে অচেনা।

মণ্টু তাকে নরেনের পরিচয় দেয়, কিন্তু দীনুর বিব্রত শঙ্কিত ভাবটা কিছুতেই ঘোচে না।

নরেন বলে, আমি ওই হাঙ্গামার ব্যাপাবটা একটু জানতে এসেছি, পরাণের ছেলে কেন মার খেল কী বৃত্তান্ত।

পবাণেব ছেলে মার খেয়েছে নাকি ? আমি তো কিছু জানি না !

তুমি তো ওর সঙ্গে ধান আনতে গিয়েছিলে ভাই। তোমার সামনে মাথাটা ফাটিয়ে দিল লাঠি মেবে, তুমি বলছ কিছুই জানি না ?

দীনু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, লাঠি মেরে মাথা ফাটিযেছে ? গাছ থেকে পড়ে গেছে শুনলাম তো।

লাঠি মেরেছে।

কী জানি, আমি জানি না। আমি আগে চলে এযেছিনু। জানে না। দীনু কিছুই জানে না। কিছু দেখা বা জানা দূরে থাক, ঘটনার সময সে ধারেকাছেও ছিল না !

হানিফের বয়স দীনুর চেয়ে কম, বেশ শক্তিশালী শক্ত চেহারা। সে দীনুর মতো ভান করল না, মাটির দিকে চেয়ে সোজাসুজি জবাব দিল, আমি এ ব্যাপাবের কিছু জানি না বাবু।

কিন্তু হানিফ—

আমি কিছু জানি না।

আমার সঙ্গে এসো দিকি একটু।

হানিফকে সঙ্গে করে দীনুর কাছে নিয়ে গিযে, নরেন প্রায় দশ-মিনিট একটানা কথা বলে যায়। খুব আবেগের সঙ্গেই সে দুজনকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, তাদের এই অন্যায়কে মেনে নেবার ভীরুতা তাদের পক্ষেই কত মারাত্মক,—যদি তারা শক্ত না হয়, প্রতিবাদ না করে, কাল জগার মাথায় লাঠি মেরেছে আরেকদিন তাদের মাথায় মারবে।

সে চুপ করলে দীনু আর হানিফ কয়েকবাব ঢোক গেলে, কিন্তু বলে সেই এককথা—তারা কিছু জানে না।

ফেরার পথে নরেন আর মণ্টু দুজনেই চুপ করে থাকে। মণ্টুর মন খুব খারাপ। মুখে সেটা ফুটেছে বেশ স্পষ্টভাবেই। নরেনের মুখ গম্ভীর।

হাঙ্গামা থেকে সরে থাকতে চায়, গা বাঁচাতে চায়। এ কী শুধুই ভীরুতা ?

এগিয়ে গিয়ে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে না চাওয়ার ভীরুতা আছে এক রকম—নিন্দা করলেও অবস্থা বিবেচনা করে সে ভীরুতাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এ যে নিজের ভীরুতা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদকে পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা !

খানিক বেলায় বংশী আবার জগার খবর নিতে এলে, নরেন তার প্রাণের আপশোশটা প্রকাশ করে বলে, ওরা এমন ভীরু ! ছিছি !

বংশী বলে, ভীরু ? হ্যাঁ, এক হিসাবে ভীরু বইকী কিন্তু ছিছি করার মতো সে রকম ভীরু নয়। কারণ আসলে ওরা ভীরুই নয়। অবস্থা ওদের ভীরু করেছে। সেটা স্বাভাবিক।

নরেন তার কথাটা বুঝতে পারে না। মানুষ ভীরু হোক কিংবা সাহসী হোক, চিরদিন অবস্থার জন্যই হয়। কিন্তু ভীরুতা ভীরুতাই—ভীরুকে ছিছি করা যাবে না কোন যুক্তিতে ?

যে জন্যই হোক, এ রকম ভীরুতা নিন্দার কথা।

ভীরুতা নিন্দার কথা বইকী ! কিন্তু এরা সত্যি ভীরু নয়। সাহসী কি মানুষ অকারণে হয়। মিছিমিছি হয় ? এমনি এমনি প্রাণ দিয়ে কেউ বীরত্ব দেখায় ? অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে যদি কোনো লাভের ভরসাই না থাকে, বরং আরও বেশি ঘায়েল হবার ভয় থাকে, কেন লোকে তা দাঁড়াবে ? ওরা একা বলেই নিজেকে দুর্বল, অসহায় মনে করে।

কিন্তু ওরা কী জানে না সবাই মিলে এক হলে —

জানে। কিন্তু ও জানার কোনো মানে নেই। এক হলে হয় বটে, কিন্তু সব কাজের বেলা এক যে সবাই হবে তার প্রমাণ কী ? একবার যদি টের পায় সবাই মিলবে, শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারবে, তখন বিশ্বাস আসে, মনে জোর পায়। তখন এদের দেখলে আপনিও বুঝবেন আজ যাদের ভীরু ভাবছেন তারা কত সাহসী।

নরেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যই যদি এক না হতে পারে, কীসে এক হবে ?

তার রাগ দেখে বংশী বলে, আপনার বয়স কম, গাঁয়ের চাষাভুসো মানুষদের ভালো করে জানেন না—ব্যাপারটা তাই ধারণা করতে পারছেন না। জগার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—ওরা দেখেও বলছে দ্যাখেনি। আপনি এর মধ্যে দেখছেন ভীরুতা। আসলে এটা কিন্তু ওদের সাধারণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয়। সাক্ষী কেবল ওরা দুজন। গাঁয়ের লোক জগার ব্যাপারটা কীভাবে নেবে, না জেনে কী করে ওরা সেটা প্রকাশ করে ? সবাই যদি একজোট না হয় ? ওরা জগার মাথায় লাঠি মারার কথা বলে বেড়াচ্ছে জানলেই শিবরাম ওদের নিকেশ করে দেবে। তার চেয়ে এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

নরেন চুপ করে থাকে।

বংশী বলে, বনের কাছের গাঁয়ের লোকেদের মাঝে মাঝে বাঘের অনাচার সইতে হয়। কেউ একা বাঘের সামনে পড়লে বীরত্ব দেখাতে বাঘ মারতে তেড়ে যায় না, সটান প্রাণ নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু বাঘমশায় সবার পক্ষেই জ্যান্ত বিপদ। কার কখন ঘাড় ভাঙবে, ছেলেমেয়ে চিবিয়ে খাবে, গোরু মারবে ঠিক নেই। বাঘটাকে মারতে তখন গাঁয়ের লোক দল বাঁধে—দা কুড়ুল লাঠি বর্শা নিয়ে সবাই মিলে ঠেঙিয়েই বাঘের দফা নিকেশ করে দেয়—বাঘের হাতেও হয়তো দু-একজন জখম হয়, মারা পড়ে।

বংশীর সহজ উপমার মানে বুঝতে নরেনের কষ্ট হয় না, কিন্তু আসল কথাটা স্পষ্ট হয় না তার কাছে।

কারও প্রাণ যাবে, কেউ জখম হবে জেনেও ওরা বাঘ মারতে এক হয়ে এগিয়ে যায় কারণ আগেও ওরা এমনইভাবে এক হয়েছে, বাঘ মরেছে। সবাই জানে যে, বাঘ মারতে সবাই এক জোট হবে। যে গাঁয়ে কোনোদিন বাঘ আসেনি, সেখানে একটা বাঘ নিয়ে ছেড়ে দিন, দেখবেন কী কাণ্ড হয়। অনেক লোক সাবাড় হয়ে যাবে—সবাই মিলে বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করতে দেরি হয়ে যাবে। আগে কখনও তো সবাই মিলে বাঘ মেরে সবাই বাঁচেনি !

নরেনের খটকা দূর হয় না। সে প্রশ্ন করে, কিন্তু ওরা যদি না বলে যে লাঠি মারতে দেখেছে, সবাই একজোট হবে কী নিয়ে ? অন্যায়টা কী হয়েছে লোকের জানা চাই তো ?

বংশী একটু হেসে বলে, আপনি গাঁয়ের লোকের ধাত জানেন না। রাগে আপনার গা জ্বালা করছে, আপনি চাইছেন এখুনি প্রতিকার হোক। গাঁয়ের লোকের অত অস্থির হলে চলে না। লোকে কী করে জানবে বলছেন ? জগার হুঁশ হলে ওর কাছ থেকেই জানবে।

তা বটে, এটা নরেনের খেয়াল ছিল না।

বংশী আবার বলে, এটা কেউ চুপচাপ সইবে না। কিন্তু হইচই করার আগে জগার হুঁশটা ফেরা দরকার। ধরুন, এদিকে খুব হইচই বাধিয়ে দেওয়া গেল—হুঁশ হবার পর কোনো কারণে জগা নিজেই বলল ও গাছ থেকেই পড়ে গিয়েছিল, কেউ ওকে লাঠি মারেনি। তখন কী ব্যাপার দাঁড়াবে ?

লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল, তবু বলবে লাঠি মারেনি ? তাই কী কেউ কখনও বলে ?

বলে বইকী। তেমন কারণ থাকলে বাধ্য হয়েই বলে। ভীম সাহাকে শিবরামের লোক পিটিয়ে প্রায় লাশ করে দিয়েছিল। তিন দিন বেহুঁশ হয়েছিল। হুঁশ হতে সে নিজেই বলল যে শিবরামের লোক তাকে মারেনি, ভিন গাঁয়ের অচেনা লোক মেরেছে। শিবরাম ওর বউকে চিকিৎসা করানোর ছুতোয় কিছু টাকা দিয়ে শাসিয়ে দিয়েছিল, চুপচাপ না থাকলে ঘর জ্বালিয়ে দেবে। খেতে পরতে পায় না, ভীম তাই সহজ যুক্তি খাটিয়ে হিসেব করল, মার যা খেয়েছে তা হজম হয়ে গেছে, গোলমাল করে লাভ কী ?

বংশীর কথাগুলি নরেনের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। এত সহজ মনে হয় কথাটা, অথচ এতদিন সত্যই এটা তার একেবারেই জানা ছিল না। দীনু আর হানিফকে একেবারে অমানুষ ভাবতে গিয়ে ভিতরটা তার অস্থির হয়ে উঠছিল। এখন সে ভাবে, সত্যই তো, কারণ না থাকলে কেন মানুষ ভীরু হবে ? সাহসী হবে ?

এক বিষয়ে ভীরুতা দেখালেই যে মানুষ সব বিষয়ে ভীরু হবে তারই বা কী মানে আছে ?

সে প্রশ্ন করে, গাঁয়ের লোক এক হয়ে জগার পক্ষ নিলে দীনু আর হানিফও মুখ খুলবে বলছেন—সাক্ষী দেবে বলেছেন ?

নিশ্চয় দেবে। আর কেউ যদি ঘটনাটা দেখে থাকে সে-ও তখন নিজে থেকে এগিয়ে আসবে।

যদি ভয় পায় ?

ভয় পাবে—কিন্তু শিবরামকে নয়, গাঁয়ের লোককে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে তো জানে, ওরা যে হাজির ছিল, ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে—এটা গাঁয়ের লোকের অজানা নয়। তখন সত্যি কথা না বলা মানেই গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে যাওয়া। সে সাহস ওদের হবে না।

জগার ভালো করে জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত গাঁয়ের চাষি সমাজ, ছেলের দল আর ভদ্রলোকের মোটা অংশ, সত্যই যেন একেবারে উদাসীন হয়েছিল, ভাগের ধানের সামান্য ভাগ চাইতে যাওয়ার অপরাধে জগার মাথায় লাঠি পড়া সম্পর্কে।

কিন্তু রাগ যে গুমরে গুমরে বাড়ছিল সকলের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবি করে আওয়াজ তোলামাত্র যে রকম সাড়া পাওয়া গেল তারই মধ্যে।

শুধু দীনু আর হানিফ নয় আরও দুজন সাক্ষী নিজে থেকে এগিয়ে এসে ঘোষণা করল—তারা স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখেছে।

সারা গাঁয়ে আগুন জ্বলে উঠতে চায়, পুড়িয়ে দিতে চায় শিবরাম আর তার ভাড়াটে গুন্ডাগুলিকে—বংশী এবং আরও কয়েকজন প্রাণপণে সে আগুনকে ঠেকিয়ে রাখে।

বলে যে, না, আমাদের সাক্ষীসাবুদ আছে শক্ত প্রমাণ আছে—যারা আইনের বড়াই করে তাদের কাছেই আমরা বিচার আদায় করব।

তবু হাঙ্গামা ঠেকানো যায় না।

জন পনেরো চাষি শিবরামের ধানের গোলা পাহারা দিচ্ছিল—দুপুররাতে শিবরামের লোকেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকজন জখম হয়, মারা যায় ভাগচাষি নন্দ কামার।

তারপর আর হাঙ্গামা ঠেকানো যায় না। শিবরাম হাঙ্গামা চাইছিল, তার আশা পূর্ণ হয়।

গাঁয়ে বসে পুলিশের ছাউনি। আরও অনেকের সঙ্গে নরেনও হাজতে চালান যায়।

নরেন হাঙ্গামায় কোনো অংশগ্রহণ করেনি। উচিত নয় বলেই গ্রহণ করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে গড়ে উঠছিল, ঘটে চলছিল যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যে ভালো করে বুঝে উঠতে পারছিল না, কীসে কী হয় কেন হয়।

এই অবস্থায় চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা নেওয়াই ভালো। বাহাদুরি করতে গিয়ে কী ভুল করে বসবে কে জানে—হয়তো ভালো করতে চেয়ে মন্দই করে বসবে গাঁয়ের লোকের।

তবু তাকে হাজতে যেতে হয়। শহর থেকে এসেছে, সে-ই উসকানি দিয়ে গাঁয়ে হাঙ্গামা ঘটিয়েছে কিনা কে জানে ! তার সেই ভিন গাঁয়ের মেসোমশায়ের চেষ্টায় দুদিন পরে সে ছাড়া পায়।

৭

একমাসের বেশি সময় দেশ-গাঁ ঘুরে নরেন ফিরে এল। মাত্র দশটা টাকা সম্বল নিয়ে !

সে গ্রাম ঘুরতে যাবে কেউ জানত না।

কেউ জানত না তার বাবার চোদ্দো পুরুষের ভিটেটা যে গাঁয়ে ছিল সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, নিজের জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে আর বুঝে উঠতে সে কেন মানুষ হয়ে জন্মেছে।

এত বড়ো বড়ো মানুষ জন্মেছে পৃথিবীতে, আজও জন্মাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তুচ্ছ মানুষ সে-ও কেন জন্মেছে।

শহরের কোনোরকমে পেট চলা চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে সে ছিটকে যায় গ্রাম, কাজ খুঁজতে, জীবনটার মানে খুঁজতে। নতুন স্কুলে কাজের চেষ্টা, অন্য কোনোরকম জীবিকার উপায় খুঁজে বার করা, এ সব ছিল উপলক্ষ।

ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য শুধু দশটা টাকা নিয়ে একমাস সে বাড়ির রেশনের অন্নে ভাগ বসায়নি, অন্তত একটা পরিষ্কার জামা একটা ধুতি ছাড়া চাকরির খোঁজে বেরোনো যায় না, এ সব পুরানো চাল চালেনি,—তবু নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেই তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে কেউ খুশি হয় না। ঝগড়া করে অতখানি তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে, একটা আশা সকলের মধ্যে জেগেছিল যে, তবে হয়তো সে নিশ্চিত কিছুর সন্ধান পেয়েছে—নইলে এত তেজ দেখায় !

মুখ বাঁকিয়ে তারিণী বলে, হ্যাঁ, ও আবার চাকরি জোটাবে !

কিন্তু দেখা যায় নরেনের তেজ মোটেই কমেনি।

সে বলে, আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম, চাকরির খোঁজে যাইনি। বাড়িতে থাকবার জন্য ফিরিনি, চলে যাব বলেই এসেছি। থাকবার একটা জায়গা খুঁজে নিয়েই চলে যাব।

তেজ তো দেখায় মানুষ, এটুকু তেজ না দেখালে চলে না বলে। কিন্তু কী সম্বল করে যাবে ? দশটা টাকা নিয়ে এক মাসের বেশি দেশে-গাঁয়ে কাটিয়ে এল, হাতে তো পয়সাকড়ি কিছুই নেই।

বাড়িতে থাকতে হওয়ার অপমানে প্রাণটা জ্বলে পুড়ে যায় নরেনের। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে, কিছু হল ?

কীসের কী হল ?

চাকরি-বাকরি কাজকর্মের ?

হ্যাঁ, একটা বাগিয়ে এসেছি।

বটে বটে ! বাহাদুর ছেলে তো। মাইনে কত ?

যা আশা করে গিয়েছিলাম তার ডবল হবে।

শুনে সুন্দরের বাবা সুরেন গোঁসাই বলে, আমার ছেলেটার জন্য কিছু করে দিতে পার না ভাই ?

চেষ্টা করব বইকী ! ওকে একবার আসতে বলবেন আমার কাছে। তবে কী জানেন—

মুখটা বাঁকিয়ে রাখে নরেন।

বুড়ো সুরেন বলে, কী বলছ ?

দিনকাল বোঝেন তো ? চাকরি বাগাতে হলে কিছু ঢালতে হয় !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ! খোঁজে কিছু আছে নাকি ?

আছে একটা। মাইনে বেশি নয়। শ খানেকের মতো হবে—

তুমি ওটা বাগিয়ে দাও বাবা, সারাজীবন তোমার জয় গাইব। কত ঢালতে হবে ?

নরেন উদাসীনের মতো বলে, ঢালতে হয় অনেক, তবে আপনার ছেলের বেলা কমেই চেষ্টা করব। গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ওকে কাল পাঠিয়ে দেবেন। এ সব কথা কেউ যেন না টের পায়—সাবধান !

সকালবেলাই সুন্দর আসে।

চব্বিশ-পঁচিশবছর বয়সের হাত ছয়েক লম্বা যুবক।

কালো কুচকুচে গায়ের রং।

বাবা পাঠালেন।

টাকা এনেছ।

এনেছি। কিন্তু—

নরেনের কান ঝাঁঝাঁ করছিল, বুক ধড়ফড়ও করছিল।

একটা ফর্ম দিচ্ছি—ফিল-আপ করে দিয়ে যাও—চাকরিটা তোমার হয়ে যাবে।

সুন্দর ফর্মটার জন্য হাত বাড়ায় না।

আমি কিন্তু দুবার দুজনকে টাকা দিয়েছি—চাকরি পাইনি। একবার পঞ্চাশ টাকা, আর একবার দেড়শো টাকা। বাবা তবু বললেন যে আপনি তো আর—

নরেন বোমার মতো ফেটে পড়ে, আমায় জুয়াচোর ঠাউরেছ ? ঠক পেয়েছ ? যাও, বেরিয়ে যাও তোমার টাকা নিয়ে !

তার মূর্তি দেখে ভয়ে সুন্দর যেন পালিয়ে যায়।

নরেন নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে। মাসখানেক কামায়নি, চুল বড়ো হয়ে গেছে। নিজের চুলের মুঠি ধরে নিজেকে নরেন বলে, জানিস পারবি না, তবু কেন চেষ্টা করিস ? এ সব তোর ধাতে নেই !

বোমার মতো ফেটে না পড়ে একটু ধৈর্য ধরলে, একটু গম্ভীর ও উদাসীনের মতো কথা বললে, টাকা যে সে নিজের জন্য নিচ্ছে না এটা একটু বুঝিয়ে দিলে, মনে সন্দেহ নিয়েও বুক ঠুকে আরেকবার ঠকবার জন্য, বেকার সুন্দর রাজি হয়ে যেত বইকী। কিন্তু ও রকম বুক ধড়ফড় আর কান ঝাঁঝাঁ করলে কেউ পাঁচটা মিনিটও ধীর গম্ভীর হয়ে চাল দিতে পারে ?

নিজের সমস্যাটা ভালো করে বিবেচনা করার জন্য, তলিয়ে বুঝবার জন্য, নরেন স্নান করতে যায়, শুদ্ধ হয়ে পূজা করতে বসার জন্য তারিণী খানিক আগে স্নান করে এসেছে—নরেন স্নান করতে যায় মাথাটা একটু ঠান্ডা করে নিজের ইতিকর্তব্য বিচার-বিবেচনা করার জন্য।

স্নান করে কুঁজো থেকে ঠান্ডা এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সে প্রায় পূজা করতে বসার মতোই চৌকিতে শতরঞ্চির উপর জোড়াসন করে বসে।

একগুঁয়েমি করছে ? ছেলেমানুষি কাঁচাবুদ্ধি আর ভাবপ্রবণতা নিয়ে এতটুকু পা নুয়ে মচকে যাবার নীতি আঁকড়ে থাকার বোকামি করছে ?

কিন্তু হিসাব তো তার খুব সোজা। ভুলটা কোথায় বোকামিটা কী করছে সে তো ধরতে পারছে না !

সে জানে কয়েকটা টাকা ধার করে জোগাড় করা যায়। কিন্তু ধার তো তাকে চাইতে হবে তারই কাছে ছাঁটাই করা বেকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে যারা একেবারে বাতিল করেনি ?

টাকা ধার করলে এদের কাছেও সে বাতিল হয়ে যাবে। স্নেহ-প্রীতি বন্ধুত্বের হিসাবে জীবনটাকে প্রায় মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা চলে—মরূদ্যানের মতোই এখানে ওখানে যেটুকু সরসতা আছে, সামান্য ক-টা টাকার জন্য তা-ও শুকিয়ে ফেলবে ?

না, অন্য অবস্থায়, চাকরি করার সময় পাঁচ-দশটাকা ধার চাইতে ভাবতে হয়নি—আজ কারও কাছে পাঁচটা টাকা চাওয়া হবে নিছক বোকামি, নিজেকে ঠকানো।

তাকের সাজানো বইগুলির দিকে তাকিয়ে নরেন নিশ্বাস ফেলে। তার কলেজের বইগুলি সযত্নে সাজানো রয়েছে—বরেনের আগামী প্রয়োজনের জন্য। এত তার কীসের নীতিজ্ঞান যে, বাপের পয়সায় কেনা বলেই দু-চারখানা বই বেচে দিয়ে উপস্থিত সমস্যা সমাধান করতে পারে না !

নরেন নিজের মনে মাথা নাড়ে। না, নীতিজ্ঞান নয়। বই বেচে ক-টা টাকা ! বেচে দেবার কোনো মানে হয় না—একটু নরম হয়ে চাইলে তারিণী তাকে পাঁচ-দশটা টাকা দেবে।

নিজের তেজ বজায় রাখার জন্য ওভাবে না চেয়ে তারিণীর টাকায় কেনা বই চুপিচুপি বেচে দেওয়া হবে উৎকট কুৎসিত ভণ্ডামি।

বইয়ের তাকের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ নরেনের মুখে একটু হাসি ফোটে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছে প্রাইজ পাওয়া বই আর মেডেলের কথা !

উপার্জন করা নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে সে ক-টা টাকার ভাবনায় পাগল হতে বসেছিল। দুটি মেডেল আর বইগুলি বিক্রি করে বাড়ি ফিরে সে বরেনের কাছে মাধবের ছাঁটাই হবার খবর শোনে।

মাধবের মতো বড়ো বড়ো ডিগ্রিওলা নামকরা আদর্শবাদী জ্ঞানী সাধক মানুষও বরখাস্ত হয় !

জ্ঞানের নেশায় মশগুল হয়ে, কলেজে তার আঁকড়ে থাকা ছেলে পড়ানো চাকরিটা থেকে।—যে চাকরিটা বজায় থাকায় নিশ্চিন্ত মনে দিল্লি থেকে ডবল মাইনের চাকরির ডাক সে কানে তোলেনি।

ছাত্রছাত্রীর এক সভায় বক্তৃতা করে তাকে চাকরিটা খোয়াতে হল।

তার পড়ানোর কায়দা পছন্দ কববে কী করবে না, ছাত্রছাত্রীরা ভেবে পায় না। কর্তা ব্যক্তিদের অবশ্য ভাবতে হয় না, তারা সোজাসুজি তার পড়ানো অপছন্দ করে।

পাসের পড়া পড়াতে পড়াতে, পাশ কাটিয়ে সে মশগুল হয়ে এমনভাবে জীবন আর জগৎ সম্পর্কে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা আর নতুন জীবনদর্শনের কথা বলতে থাকে, যে ছাত্র এবং কয়েকটি ছাত্রী মুগ্ধ অভিভূত হয়ে শোনে।

দু-চারজনের রোমাঞ্চও হয়।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে যায় তাদের রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা।

এভাবে এ সব কথা পড়ালে তারা পরীক্ষা পাস করবে কী করে ? পরীক্ষা পাস করার জন্যই তারা এত টাকা খরচ করে কলেজে পড়ছে, গুরুজনেরা এত কষ্টের টাকা ঢালছে।

ক্লাসে এ সব কথা কেন ?

মাধবের মতো বিদ্বান না হোক, পরীক্ষা পাসার্থী ছাত্রছাত্রী, তারাও কী এ সব কথা আলোচনা করে না, তর্ক চালাতে চালাতে ঝগড়া করে না,—আড্ডায়, বৈঠকে, চায়ের দোকানে, সংঘে, সমিতিতে ?

একবার তাদের শুধু বললেই হয় যে পাসের পড়া পড়াচ্ছি এখন, আমার কিন্তু আরও কিছু অন্য কিছু বলার আছে। শুনতে চাইলে ব্যবস্থা কর।

তারা কী ব্যবস্থা করত না ?

তারা কী শুনতে চায় না পাসের পড়ার চেয়েও দামি তার বাড়তি কথা ?

ছাত্রছাত্রীরা পরামর্শ করে তাকে তার বাড়তি বক্তব্য বলবার একটা ব্যবস্থা করে। শুধু তার ক্লাসের বা কলেজের নয় সব ছাত্রছাত্রীই শুনবে। কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, সভার আয়োজন করে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

আগেও অনেক কষ্টে কলেজের বাইরে তারা আয়োজন করেছে, এমন একটি ক্লাসে যেখানে যতক্ষণ ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, প্রাণ খুলে সে তার প্রাণের কথা বলে যেতে পারবে। কিন্তু তাকে নিয়েই যাওয়া যায়নি এ রকম কত ক্লাসে ?

প্রস্তাব শুনেই অবশ্য খুশি হয়ে বলেছে, যাব যাব—নিশ্চয় যাব। আমি নিজেই যাব।

কিন্তু বাড়ি থেকে পথ দেখিয়ে তাকে আনতে গিয়ে সভার প্রতিনিধিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে মানসীর।

উনি তো যেতে পারবেন না। জরুরি কাজ করছেন।

এবার কলেজের বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সভা ডেকে তারা মাধবকে করেছে প্রধান বক্তা। কলেজের সভা ? নববর্ষ উপলক্ষে ? যাবে যাবে মাধব নিশ্চয় যাবে !

কিন্তু এবারও সেই একই ব্যাপার গটে ! মানসী জানায় মাধব যেতে পারবে না। শুনে রমেন একেবারে থ বনে যায়।

যাবেন বলেছিলেন, সবাই এসে গেছে, ওঁর নাম ছাপিয়ে দিয়েছি—।

কী করা যায় বলো ভাই ? বুঝতেই পারছ ইনি সে রকম মানুষ নন। সভায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে নাম কুড়োলে যে আখেরে লাভ হয়—এ সব মানুষ সেটা বোঝে। কিন্তু নামের চেয়ে জ্ঞান এদের কাছে বড়ো—নিন্দা প্রশংসার চেয়ে আদর্শটা অনেক বড়ো।

মাধবের বিশ বছর বয়সি অজানা অচেনা ছাত্রটিকে বাগে পেয়ে মানসী যেন ছোটখাটো একটা লেকচার ঝেড়ে দেয় !

স্বামীর সপক্ষেই অবশ্য দেয়।

টের পায় রাগে গনগন করছে রোগা লম্বা গলাবন্ধ কোট-পরা ছেলেটা। ফরসা মুখ লাল হয়ে গেছে।

রাগ চেপে রেখে রমেন বলে, আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলব। ওঁর জন্যই আমরা এবার বিশেষভাবে আয়োজন করেছি, উনি শিক্ষার বিষয়ে বলবেন বলেছেন। অন্য কলেজের ছেলেরা এসেছে। এখন উনি বলছেন যাবেন না ?

মানসীর নিজেরও যেন লজ্জা করে। রাগুক মাধব, সে তাকে সভায় পাঠাবার চেষ্টা করে দেখবে।

এত তার ভয়-ভাবনা কেন, নিজের জন্য ?

মানসী একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ধীরকণ্ঠে জোর গলায় বলে, পাঁচ মিনিট বোসো তো ভাই। দেখি চেষ্টা করে মানুষটাকে তোমাদের সভায় পাঠাতে পারি কি না।

চারিদিকে বই ছড়ানো, কাগজপত্র ছড়ানো।

একটা প্রায় একসেরি ওজনের বইয়ের শেষের দিকের পাতায় মাধব মুখ গুঁজে আছে।

শুনছ ?

ভয়ে ভয়েই বলে মানসী।

আগেও কয়েকবার বিশেষ দরকারে সময় শুধু শুনছো বলে ডাকামাত্র মাধব খেপে গিয়ে তাকে প্রায় মারতে বসেছিল !

কেন মারেনি সেটা অবশ্য বিধাতার কারসাজি।

মারলে সে নিশ্চয় প্রতিশোধ নিত। মাধবকে মারত না, গটগট করে বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে। ছেলেমেয়ের মায়া কাটিয়ে যেত। স্বামীকে ছাপাবই নিয়ে মাতাল হতে দিয়ে যেত।

মায়ের পেটের বোন আছে। বড়োলোকের বউ বড়ো বোন, সটান তাব কাছে চলে যেত।

মানসী আবার বলে, শুনছ ! ছেলেটি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মাধব বলে, বলে দাও না, আমার শবীর খাবাপ, যেতে পারব না !

আমার একটা কথা শুনবে ?

গেট আউট।

মাথায় রক্ত চড়ে যায় মানসীর, সাধ হয় খাটের ভাঙা পায়াটা কুড়িয়ে নিয়ে এক আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দেয় মানুষটার মাথা। যা হবার হবে, তারপরে হবে।

কিন্তু শান্তসুরেই জিজ্ঞাসা করে, তোমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে চেয়েছে, কী বলব ছেলেটাকে ?

বলে দাও, চুলোয় যাক।

সত্যি বলব ?

মাথা খারাপ নাকি তোমার ? বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝিয়ে বিদেয় করে দিতে পার না ?

মাধবী প্রাণপণ চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে।

একবার গেলে পারতে না ? নিজেই বলেছিলে যাবে। সবাইকে বসিয়ে রেখে বেচারা তোমাকে নিতে এসেছে—

গেট আউট। গেট আউট আই সে !

মানসী দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে বলে, ইয়েস, ইয়েস, আই অ্যাম গেটিং আউট। কিন্তু ছেলেটাকে কী বলব ?

মাধব নিজে কুঁজো থেকে গড়িয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল প্রায় মরুভূমির তৃষ্ণার্তের মতো শুষে নেয়।

আমি জানতাম তুমি এভাবে জল খাবে। এই জন্য সকালবেলা কুঁজো ভরে জল বেখেছি। ছেলেটাকে কী বলব ? পরে তুমিই আবার আমার উপর চটে যাবে !

মাধবের জ্ঞানের নেশা কেটে গিয়েছিল। সে বলে, থাক, বলেছিলাম যখন, একবার গিয়ে ঘুরে আসি।

মানসী স্বস্তি বোধ করে বলে, আমি তো তাই বলছি।

মানসী কী জানত মাধবের সেই বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কী ফল হবে !

জানলে বোধ হয় মাধবকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে নিজেই সে ছেলেটিকে বিদায় করে দিত।

যাবে বলে থাকলেও মাধব রেগে বিরক্ত হয়ে সভায় যায়। পথে খেয়াল হয় কী বিষয়ে বলবে তাও সে ভুলে গেছে।

ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করতে সে আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি নিজেই বলেছিলেন ছাত্রজীবন আর রাজনীতি নিয়ে বলবেন ?

ও, হ্যাঁ।

ছাত্রজীবন আর রাজনীতি নিযেই মাধব বক্তৃতা করে—একেবারে যেন আগুন ছুটিয়ে দেয় সভায়। বলতে আরম্ভ করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টের পাওয়া যায় সে জমে গেছে এবং রেগে আছে—নিজের বক্তব্য ছাড়া বিশ্বসংসাব ভুলে গেছে। মাধব নিজে কখনও রাজনীতি করেনি কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—তার থিয়েরিটা পরিষ্কার।

শিক্ষার অব্যবস্থার সঙ্গে অন্য সমস্ত অব্যবস্থার অন্যায় ও দুর্নীতির যোগাযোগগুলি দেখিয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে ও সব বজায় থাকলে শিক্ষাব অব্যবস্থা কোনোমতেই দূর হতে পারে না, পৃথক করে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থাব জন্য আন্দোলন করার অর্থ হয় না। সুতরাং ভালো শিক্ষালাভই যদি ছাত্রজীবনের একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাজ ধরেও নেওয়া যায়—এই নীতি অনুসারে, শিক্ষার খাতিরে, ছাত্রদের কোমর বেঁধে সব কিছু ঠিক করার কাজে অর্থাৎ রাজনীতি করতে নেমে পড়তে হবে।

শুধু যুক্তিতর্ক নিয়মনীতিগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে যদি সে বলত তাহলে এতটা শোরগোল হত না তার বক্তৃতা নিয়ে। ছাত্রজীবনেও রাজনীতি বাদ দেওয়া চলে না এ কথা তো কতজনেই কতভাবে বলেছে এবং বলছে। কর্তৃপক্ষ একটু ধমকধামক দিয়ে, একটু সাবধান করে দিয়েই তাকে বেহাই দিত।

কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের সময় রাজনৈতিক সভাতেও এ রকম গরম বক্তৃতা কম শোনা যায়। বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যখন একটা গোলমাল চলছে তখন ছাত্রছাত্রীর প্রকাশ্য সভায় এ রকম বক্তৃতা করা !

তবু হয়তো ত্রুটি স্বীকার কবলে, আত্মসম্মান বজায় বেখে কৌশলে আর কবব না বলতে পারলে তার চাকরিটা যেত না।

কর্তৃপক্ষ কথাটা তুলতেই সে গেল চটে।—কেন ? কোন কথাটা ভুল বলেছি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমি আরেকটা সভা ডেকে ভুল স্বীকার করব আমি এখন পর্যন্ত জানি, একটি কথাও আমি ভুল বলিনি।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাকে কলেজ থেকে বিদায় নিতে হল।

মাধবের চাকরি গেছে শুনেই নরেন চমকে উঠে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভেবেছিল, কেন ?—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

তাদের মতো অংসখ্য সাধারণ মানুষের বেকার থাকার ব্যবস্থাটা যাদের, তাদের সঙ্গে মনে অমিল হলে মাধবকেও ঘায়েল হতে হবে বইকী !

এ চাকরিতে যা পেত তার ডবল বেতনে দিল্লির চাকরি যে নেয় না, চাকরিটা না নিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে পর্যন্ত শত্রু হয়ে দাঁড়ায়—জ্ঞানের আদর্শবাদী হলেও কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মতে না মিললে এবং সেটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলে মাধবেরও চাকরি যাবে বইকী !

তার যেন আনন্দ হয়। মনে স্ফূর্তি জাগে।

মাধবকে সে যেন নিজেদের দলে পেয়েছে। মাধবও যেন তার সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে মানুষ হিসাবে।

সে ছুটে যায় মাধবের বাড়ি, গিয়ে প্রথমেই মর্মান্তিক আঘাত পায় মনে। মানসী বাড়িতে নেই।

মাধব বেকার হয়েছে শুনেই মানসী গটগট করে সোজা তার দিদির কাছে চলে গিয়েছে !

বাচ্চা ছেলেটাকে শুধু সঙ্গে নিয়েছে।

বড়ো তিনজনের দায় ফেলে রেখে গিয়েছে মাধবের ঘাড়ে !

মাধব শান্তভাবেই মানসীর বিরুদ্ধে তার নালিশ প্রকাশ করে।

কীরকম বুদ্ধি বিবেচনা একবার ভেবে দেখুন। অন্যায় করে ডিসমিস করেছে—আমি ফাইট করলে চাকরিটা আবার বজায় রাখতে ওরা বাধ্য হবে বুঝিয়ে বললাম যে কিছু ভেব না, ওরা আমাকে তাড়াতে পারবে না—মাথা নিচু করে আবাব ডিসমিস করার হুকুমটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। শুনে বলল কী জানেন ?

মানসী কী বলেছিল নরেন খানিকটা অনুমান করে কিন্তু অজ্ঞানীর মতো চুপ করেই থাকে।

মাধব বলে, হন্যের মতো ঝেঁঝে উঠল—দিল্লির চাকরিটা নিলে না কেন ?—বলেই বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই বেশে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। জিজ্ঞেস কবলাম, কী হল, কোথায় যাচ্ছ ? জবাব এল, দিদির কাছে যাচ্ছি—দিল্লির চাকুরিটার মতো চাকরি না হলে আমায় ডাকতে যেয়ো না।

নরেন চুপ করে থাকে।

মানসীর দিদি অতসী যে শহরের আধুনিকতম প্রাসাদগুলির একটাতে থাকে এটা তার জানাই ছিল।

কিন্তু দিদি তো কোনোদিন আসে না, চিঠি লিখে জিজ্ঞাসাও করে না মানসী কেমন আছে !

তার কাছেই মানসী কতবার গর্ব করে বলেছে : জানেন ? দিদি একটা পয়সাওলা মুখ্যু ব্যাবসাদারের বউ আর আমি একজন গরিব নাম-করা বিদ্বানের বউ বলে দিদি আমায় কীরকম হিংসা করে ? আমার বিয়ের পর একবার মোটে এসেছিল, ঘণ্টাখানেকের জন্য। তারপর আর আসেনি।

সগর্বে মাথা উঁচু করে মানসী বলেছে, খোকনের অন্নপ্রাশন হবে, নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলাম ! আমার তো উচিত নিজের দিদিকে নেমন্তন্ন করা আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে ? গিয়ে দাঁড়াতেই দিদি বলেছিল, আমি তোকে একটি পয়সাও সাহায্য করতে পারব না মনু। কেন এসে আমায় জ্বালাতন করিস ?

নরেন আমতা আমতা করে বলেছিল, একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয় ?

মানসী বলেছিল, সামান্য ব্যাপার—তাকে কিছু হওয়া বলে না। দিদির কাছে থেকেই তো পড়তাম কলেজে ? ভোলাদা একদিন তামাশা করে আমার গালটা টিপে দিয়েছিল, দিদি দেখে ফেলেছিল। তারপরেই বোর্ডিংয়ে যেতে হল, মাধব বলামাত্র ওর সঙ্গে আমাকে গেঁথে দেওয়া হল। দিদি আর খবরও নেয় না বেঁচে আছি কী মরে গেছি।

মাধবের চাকরি যাবার খবর শুনেই বাচ্চা ছেলেটাকে বগলদাবা করে এক কাপড়ে মানসী চলে গিয়েছে তার সেই দিদির বাড়িতে !

চাকরি খোয়ানো বেকার মাধবের চেয়ে তার বড়োলোক ব্যাবসাদার ভগ্নীপতির বউ ওই দিদির কাছে যাওয়াই সে শ্রেয় মনে করল ?

মাথা ঘুরে যায় নরেনের।

এ অবস্থাতেও মাধবের মাথা বেশ ঠান্ডা আছে দেখে আরও যেন বেশি ঘুরে যায় তার মাথা !

মাধব বলে, দিদির কাছে গিয়েছে যাক, সে জন্য নয়। আমি দিল্লির চাকরি নিলাম না, এ চাকরিটাও খুইয়ে বসলাম—এর জন্য রাগ করে গিয়েছে, সে জন্যও নয়। অন্যায় করে আমায় তাড়িয়েছে, ফাইট করে এটা আমি পালটে দেব—এ সব কথা শুনেও চলে গেল, এটাই প্রাণে বড়ো লাগছে।

প্রাণে লাগছে !

প্রাণে ! মাধবের মতো জ্ঞানীর প্রাণেও তবে আঘাত লাগে।

৮

কোথায় আস্তানা গাড়বে ? দীননাথেরা যে বস্তিতে গিয়ে উঠেছে, নরেন সেখানে গিয়ে হাজির হয়।

খুব ভোরে যায়, দীননাথ কাজের খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে।

বলে, ঘরটার জন্য কত ভাড়া দাও ?

একলা তো নয়, তিনজনে থাকি, ভাগাভাগি করে দিই।

চারজনের জায়গা হয় না ? ভাড়াটা আরও ভাগাভাগি হয়ে যেত ?

কষ্ট হবে—এত গাদাগাদি অভ্যাস নেই আপনার।

কিছু কষ্ট করতেই হবে। আমাকে আর আপনি বোলো না দীননাথ—তোমাদের দলেই ভিড়ে গেছি।

বস্তির ঘরের ভাগাভাগির ভাড়াটাও আগাম দিতে হয় ! অন্য দুজন ভাড়াটে, লোচন আর ভূপাল ছেড়ে কথা কয় না।

ক-দিন এখানে কাটল।

প্রাইজের বই আর মেডেল বিক্রির পয়সা শেষ হল।

এবার দিন কাটবে কী করে কে জানে !

সারাদিন ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত নরেন এই কথাটাই ভাববার চেষ্টা করে !

বাইরে রোদের তেজ কমার আগেই ঘরের ভিতরটা আবছা মেরে যাচ্ছে। ঘর খোলার হলেও মদনের ঘরটাকে তবু ঘর বলা চলে, সেই ঘরের গায়ে ঢালু চালার নীচে কায়দা করে তৈরি করা এই ছোট্ট খোপরটাকে ঘর বললে হোগলার ঘরগুলিকেও অপমান করা হয়।

তবে জানালাটা পুবের বাগানের দিকে। বিকাল হতে না হতে দিনের আলো আসা কমে যায়, সকালবেলা জানালাটা দিয়ে বারোমাস একফালি রোদ তাদের এই ঘরে ঢোকে।

সূর্য চলে উত্তরে দক্ষিণে। রোদের ফালিটাও বাড়ে কমে। বছরে একটা দিনও বাদ যায় না। অল্পক্ষণের জন্য হলেও অন্তত একটুখানি রোদ তাদের খোপরে ঝিলিক মেরে যায়।

এখানে অশিক্ষিত মানুষগুলিব মধ্যে এসে কয়েক দিন বাস করে, এদের জীবনযুদ্ধের নগ্ন বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে নরেনের নতুন চিন্তার খোরাক জোটা ছাড়াও একটা বড়ো রকম মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। শিক্ষা আর পাস করার উপর তার যে একটা বিজাতীয় ঘৃণা আর রাগ জন্মেছিল—সেটা কেটে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শিক্ষায় বঞ্চিত মানুষ নিজেরই কত মিথ্যা ধারণা ও বিশ্বাসের কাছে ক্রীতদাসের মতো বাঁধা পড়ে আছে সেটা তার নজরে পড়েছিল. কিন্তু শিক্ষার মূল্য যে কত সেটা এ রকম স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

গ্রাম্য জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে এমন একটা সামঞ্জস্য আছে অশিক্ষিত মনগুলির বিকার ও অন্ধকারের যে, শিক্ষাব অভাবের কথাটা যেন বড়ো হয়ে উঠতে পারে না, শিক্ষালাভে বঞ্চিত হবার অভিশাপটা এতখানি প্রকট হয়ে দাঁড়ায় না।

শহরের এই বস্তিতে এলে ভালো করে টের পাওয়া যায় শিক্ষায় বঞ্চিত হবার সে অভিশাপ কেমন।

না, শিক্ষা খারাপ নয়। পাস করা খারাপ নয়।

শিক্ষার ব্যবস্থায় অনেক খুঁত আছে বলে, পাস করে বেকারি ববণ করতে হয় বলে গায়ের জ্বালায় চোখ-কান বুজে পড়াশোনা আর পাস করার উপর চটে যাওয়া উচিত নয় !

এদিক দিয়ে নরেন সত্যই পরম স্বস্তি বোধ করে। শিক্ষা আর সভ্যতার বিরুদ্ধে কী জ্বালাটাই তার মধ্যে জমেছিল ! সেটা জুড়িয়েছে।

বাইরে খোলা আকাশ আলো বাতাস। মানুষ আর পশুপাখির একটানা জীবনযাপন।

মদনের রোয়াক দিয়ে উঠান হয়ে বাইরে যাতায়াত। গোবর-লেপা স্যাঁতসেঁতে সরু রোয়াকের একদিকে মদনের বউ রান্না করে, অন্যদিকে একটা দড়ি বেঁধে ঝোলানো প্যাকিং বাক্সের দোলায় ঘুমিয়ে থাকে তার বাচ্চা ছেলেটা।

কী ঘুমটাই যে ঘুমায় দেড় বছরের বাচ্চা ছেলে ! কখন জাগে, কখন ক্ষীণকণ্ঠে একটু কাঁদে খিদেয় তেষ্টায়, নরেন যেন টেরও পায় না।

এতই কমজোরি তার কান্না।

ছোটো উঠান। লম্বাটে হলেও চারকোনা। চারদিকে চারখানা ঘর তোলাই সম্ভব এবং উচিত। কী কায়দায় যে এইটুকু উঠান ঘিরে ন-খানা কুঠুরি গড়া গেছে আর তাদের চারজনকে বাদ দিয়ে সাতটি পরিবারকে ঘর ভাড়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছে, নরেনের মাথায় ঢোকে না।

স্কুল থেকে কলেজের ডিগ্রির ক্লাস পর্যন্ত জ্যামিতি বেশ ভালোভাবেই হজম করেছে, মজা পেয়েছে। তাই মনে হয়—হয় এই খোলার ঘরগুলি ম্যাজিকের তামাশা, নয় ওই জ্যামিতির নিয়মগুলি মিথ্যা।

বেলায় বেলায় আঁচ পড়েছে। তিনটি উনানে। আরও দুটি উনানে আঁচ পড়বে সন্ধ্যা নাগাদ। রান্না সামান্য, রুটি পাকানো অথবা চাল আর ঘাসপাতা সিদ্ধ করা—তবু সেটা বেলায় বেলায় সারলে আলোর খরচ বাঁচে।

খোলার ঘরের এরাও টের পেয়েছে যে গত মহাযুদ্ধে তাদের মতো অনেক উলুখড়ের প্রাণ দেওয়াতেই শেষ হয়ে যায়নি যুদ্ধের বিপদ, মহাযুদ্ধের আরেকটা লন্ডভন্ড ভয়ংকর কাণ্ড বাধাবার চেষ্টা চলেছে পুরা দমে।

টের না পেয়ে উপায় নেই। কী রেটে চড়ে কোথায় উঠেছে জীবনযাত্রায় দরকারি সব কিছুর দাম !

ডিবরি জ্বাললে যেন প্রাণটাও জ্বলে যায় সেই সঙ্গে—কী দামে কেনা তেল ডিবরিতে পুড়ছে ভেবে।

সাতঘর ভাড়াটে।

ক-দিন উনান ধরছে পাঁচটি।

দুটি পরিবারের কী একটু আগুন জেলে পিন্ডি সিদ্ধ করে খাওয়ার দরকার ফুরিয়ে গেছে ?

তা নয়।

হারাধন আর তার বউ মোক্ষদার এসেছে পালাজ্বর—একসঙ্গে। নরেন খবর নিতে গিয়ে দেখেছিল হারাধনের আরাম করে শোয়ার বাঁশ আর নারকেল দড়ির খাটিয়াটা খালি পড়ে আছে। সংগ্রহ করা ইট আর কাঠের তক্তা দিয়ে মোক্ষদার তৈরি খাটে পুরানো ছেঁড়া তোশকের বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে জড়াজড়ি করে দুজনে পালাজ্বরের শীতে কাঁপছে !

ছেলেমেয়ে নেই তার রক্ষা।

দক্ষিণের চালাটার পুবের দিকের খোপরে থাকে সাবিত্রী। সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, কে স্বামী কোথায় থাকে, কেউ জানে না। তিনটি ছেলেমেয়ে—বড়ো মেয়েটির বয়স বছর আষ্টেক, ছোটোটির চার। মাঝেরটি ছেলে।

দিন চারেক কোনো পাত্তা নেই সাবিত্রীর।

তার উনানটাতেও আঁচ পড়ে না।

শিখা, বলাই আর চাঁপা চালিয়ে যাচ্ছে অরন্ধনের পালা। নিজেদের চেষ্টায় বেঁচে থাকার লড়াই।

নেতৃত্ব শিখার।

চেয়ে, কুড়িয়ে, চুরি করে কীভাবে তারা তিনজন দিন চালাচ্ছে খুঁটিনাটি না জানলেও নরেন মোটামুটি আঁচ করতে পারে।

কাল থেকে শানাই বাজছে গজেন সরকারের বাড়িতে। মানুষ গিজগিজ করছে। এলোপাথারি হইচই ছুটোছুটি আদর-আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়ার মহোৎসব চলছে প্রকাণ্ড বাড়িটাতে।

শিখার নেতৃত্বে তিনজন বিয়ের রাত্রে ওই বাড়িতে পাতা পেড়ে ভোজ খেয়ে এসেছে।

নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেনি ! মেরে ধরে দুরদুর করে কুকুর-বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকে ভয় করেনি।

রীতিমতো মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করে এটা সম্ভব করেছে।

নরেন গিয়েছিল বিধুর দোকানে চিড়ে কিনতে। শিখা গিয়েছিল ধারে চার পয়সার এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান জোগাড় করতে। চার পয়সার এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান ধারে পাওয়ার জন্য সে কী লড়াই বুড়ো দোকানি বিধুর সঙ্গে ছেলেমানুষ মেয়েটার !

বিধু কিছুতেই ধারে তাকে চার পয়সার সাবান দেবে না, শিখাও ধারে সাবানের টুকরোটি না বাগিয়ে ছাড়বে না।

বাবা নয়তো মা বাড়ি এলেই তুমি তোমার সাবানের দাম পাবে। বলছি তো পাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কত পাব তা জানাই আছে। যা যা ভাগ।

ভাগ ভাগ করে তাড়িয়ে দিলেও শিখা এক ইঞ্চি পিছু ভাগেনি। আলুর বস্তার উপর আরও খানিক উপুড় হয়ে সামনে ঝুঁকে সে বলেছে, চার পয়সার সাবান ধারে দেবে না তো বিধুকাকা ? বামুনের বাড়ি বিয়ে। বামুনের মেয়ে নেমন্তন্ন রাখতে যাব। একটু সাফ করা চাই তো জামা-কাপড়টা ? কেন মিছে বামুনের মেয়ের অভিশাপ খাবে চার পয়সার সাবানের জন্যে ! মা-বাবা একজন ফিরে এলেই দাম ঠিক পাবে।

বিধু সাড়ে-পাঁচআনা দামের বিদেশি কোম্পানির কাপড়কাচা সাবানটা শিখার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, নে বাছা, নে। তোর বাপ যে বামুন, তুই যে বামুনের মেয়ে, তোর বাপ সেটা খেয়াল রাখতে দেয় ? চাঁড়ালের অধম চালচলন হয়েছে তোর বাপের।

শিখা সাবানটা ফেরত দিয়ে বলেছিল, এত দামি সাবান চাইনি তো, চার পয়সার একটা কাপড়কাচা সাবান দাও।

কত হিসাব এতটুকু মেয়ের ! চার পয়সাব সাবানে যে কাজ চলে সে জন্য সাড়ে-পাঁচআনার সাবান ধারে নেওযাও বোকামি, শুধু এ হিসাবে নয়। সাবানটা নিযে অন্য দোকানে ফেরত দেবার ছলে পুরো দাম আদায় কবা কিংবা চাব-ছপয়সা কমে কারও কাছে বিক্রি করার কায়দায় কয়েক আনা লাভ করাও যে বোকামি- এ হিসাবও শিখা জানে !

সেই সাবানে শিখা সাফ করেছিল তার নিজের একটা না-শাড়ি না-ধুতি কাপড় আর ভাইবোনের ছেঁড়া জামা।

চার পয়সার সাবানে সাফ কবা পোশাক পরে তারা তিনজনে প্রকাণ্ড তিনতলা ইটের প্রাসাদ-বাড়িতে বিয়ের ভোজের সারি বেঁধে পাতা আসনের তিনটি আসন দখল করে ভোজ খেয়ে এসেছে !

সে কী খাবে ? অতটুকু মেয়ে ব্যবস্থা করে নিজে ভোজ খেয়ে এসেছে, ভাইবোনদের ভোজ খাইয়েছে—এত বড়ো জোয়ান মদ্দ গ্র্যাজুয়েট মানুষটা সে ভেবে পাচ্ছে না উপোস ঠেকানোর উপায় !

মাধবেব বইটার দিকে চোখ পড়ে।

মাধবেবও চাকরি নেই শুনে সেদিন দেখা করতে গিযে সে এই বইটা এনেছিল। এ অবস্থাতেও সে বই পড়তে চায়। পেটের খিদেয় চোখের সামনে অক্ষর ঝাপসা হযে আসে —তবু বই পড়ার নেশা যেন কাটতে চায় না।

কিন্তু শেষ করতে পারেনি বইটা।

নেশা আছে—খিদেয় ঝিমিযে গেছে নেশাটা।

বইটা পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিলে উপস্থিত সমস্যার সমাধান হয়।

মাধবের অনেক বই আছে, তার হয়তো খেয়ালও নেই তাকে বই দিয়েছে কী দেয়নি।

মোটা বই, দামি বই। দুটো তিনটে টাকাও কী পাওয়া যাবে না ওটা বইয়ের পুরানো বাজারে বিক্রি করে ?

বই হাতে করে নবেন বেরিয়ে যায়।

ভিতরে যেন উথলে উথলে উঠতে চায় প্রতিবাদের ঢেউ,—একেবারে হৃদয়ের ভিতরে।

কষ্ট জীবনে কম পায়নি। কিন্তু ছ্যাঁচরামি করেনি কোনোদিন।

নিরুপায় হয়ে আজ তাই করবে ?

সেকেন্ড হ্যান্ড বুকশপের সামনে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নরেন নিজের মনেই কয়েকবার মাথা নেড়ে জ্বালাভরা হাসি হাসে। তারপর সোজা মাধবের বাড়িতে চলে যায়।

বলে, শেষ হয়নি, তবু ফিরিয়ে দিতে এলাম বইটা।

কেন ? ক-দিন পরেই দেবেন।

নরেন ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলে, না। দোহাই আপনার, আমাকে আর বই দেবেন না। এ রকম বিপদে ফেলবেন না। পেটের জ্বালায় বইটা বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিলাম ! কাছে থাকলে হয়তো সামলাতে পারব না, ফেরত দেওয়াই ভালো।

মাধব খানিকক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধব আজ বই পড়ছিল না। মেয়ের জ্বর হয়েছে—তার কপালে জলপটি দিচ্ছিল।

জলপটি ! আইসব্যাগ নয়।

ক-দিনে চেহারা পর্যন্ত যেন অন্যরকম হয়ে গেছে মাধবের।

যদি অপমান মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।

টাকা ধার নেব না কিন্তু, ওতে কোনো লাভ নেই—শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায় না। মাঝখান থেকে ঢিলেমি আসে।

মাধব সহজভাবেই বলে, টাকা ধার দেবার অফার নয়। একটা টেম্পোরারি কাজের কথা বলছিলাম।

কাজ করে পয়সা পাওয়ার জন্য ওত পেতে আছি। যে কোনো কাজের অফার দিন, কিছুমাত্র অপমান বোধ করব না।

কাজ করে পয়সা রোজগারের কথাই বলছি। আমার নিজের কাজ কিনা, তাই বলতে একটু সংকোচ হচ্ছিল। অ্যাদ্দিন খেটেখুটে যে বইটা লিখছিলাম, ওটা ছাপতে দেব ঠিক করেছি। ম্যানাসক্রিপ্ট রেডি কিন্তু বড্ড বেশি কাটাকুটি হিজিবিজি হয়ে আছে,—একটা ফেয়ার কপি করে প্রেসে দিতে হবে।

মাধব একটু থামে। নরেন চুপ করে থাকে।

দেখছেন তো কীরকম ঝঞ্ঝাটে আছি—ওদিকে চাকরির ব্যাপার, এদিকে ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া, ও সব কপি করার কাজ আমার একদম আসে না। আপনি ওটা নিয়ে গিয়ে যদি কপি করে দেন, প্রেসে দেবার পর প্রুফটাও দেখে দেন—

নরেনের মুখ দেখে মাধব জোর দিয়ে বলে, কাজ করে বন্ধুর কাছে টাকা নিতে কোনো অপমান নেই। আপনি না করলে আমি আরেকজনকে দিয়ে করাব—টাকা আমাকে দিতেই হবে।

নরেন বলে, অপমান নয়। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। নিজে বইটা ছাপাবেন ? কোনো পাবলিশার পেলেন না ? পাবলিশারকে দিয়ে দিলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যেত।

কোথায় আবার পাবলিশার খুঁজে বেড়াব ? নিজেই ছাপছি।

সে কথাটাই ভাবছিলাম। আপনাদের মতো লোকের কাছে পাবলিশাররা আসে না কেন ? আপনার ম্যানাসক্রিপ্ট তৈরি আছে জানা থাক বা না থাক, তাগিদ দিয়ে আপনাদের দিয়ে বই লেখায় না কেন ?

তাদের কী গরজ ?

গরজ বইকী—বই প্রকাশ করাই তাদের ব্যাবসা। ভালো বই হলে তাদেরও লাভ। ওদের এটুকু খেয়াল হয় না যে আপনাদেব মতো যারা দামি বই লিখতে পারেন তাদের আবার পাবলিশার খুঁজে বেড়াবার ঝঞ্ঝাট পোষায় না ? এ রকম অনেকে আছেন, জীবনে শুধু বই পড়ে জ্ঞানের চর্চাই করে যান—বই লেখার কথাটা মনেও আসে না। এটা সবারই লোকসান অনেক দামি কথা নতুন কথা ভেবেছেন, লিখে রেখে গেলেন না বলে আমরা পেলাম না।

মুখে এ কথা বলে বটে কিন্তু মনে মনে নরেনের খটকা লাগে, সত্যই কি এটা লোকসান ? জ্ঞানী ব্যক্তিরা বই তো কিছু কম লেখেনি, লেখাতে কামাইও পড়েনি—দোকানে দোকানে রাশি রাশি বই !

তার মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য পুরানো জ্ঞানের জাবরকাটা, যা মানুষ আগেই জেনেছে সেটাই আবার অন্যভাবে বলার চেষ্টা।

পুরানো মোটা কথাকে সরু করে এবং সরু কথাকে মোটা করে নূতনত্ব ফলাবার চেষ্টা। জেনেশুনে সকলেই যে ফাঁকি দিয়ে নাম করার জন্য এ রকম চেষ্টা করে তা নয়। অনেকের জানাই

থাকে না যে জ্ঞানের জাবর কেটে ফাঁকির কারবার চালাচ্ছি, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে আমি নতুন কথা বললাম, মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে ধন্য হলাম !

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা করার মতো নতুন জ্ঞান খাঁটি জ্ঞান যদি কারও দেওয়ার থাকে, প্রকাশকদের উদ্যোগের অভাবে সেটা কেন চাপা পড়ে যায় ?

তবু এত জ্ঞান কোথায় পেল মানুষ, এতদূর এগোল কী করে ?

কার্ল মার্কসকে দেশ থেকে দূর করে দিলেও কী তার নতুন জ্ঞানের প্রচার এবং প্রসার প্রকাশকের অভাবে চাপা পড়ে গেছে ?

বিদেশে দারিদ্র্য ভোগ করেও কী সারা জগতের স্বীকৃত পুরানো সত্যমিথ্যার জ্ঞানকে অবলম্বন করেই নতুন আলোকে নতুন সত্যমিথ্যার জ্ঞান সৃষ্টি করে সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া ঠেকে থেকেছে ?

কী ভাবছেন ?—প্রস্তাবটা পছন্দ হল না ?

পছন্দ হয়েছে বইকী। কাপড়ের দোকানে খাতা লেখার কাজ চেয়ে পাইনি—আপনি তো আমায় যেচে মস্ত সম্মান দিলেন, আমার বিদ্যাকে মূল্য দিলেন।

মাধব ভারী খুশি হয়।

একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়ে বলে, শুনে আপনি হয়তো চমকে যাবেন, তবু আপনাকে বলি। মানসীর ব্যবহারে আমার যত রাগ দুঃখ জ্বালা হয়েছিল, সব প্রায় মিলিয়ে গেছে। ও যদি এ রকম ব্যবহার না করত, আমাকে এ রকম বিশ্রী অবস্থায় ফেলে চলে না যেত— আমি বোধ হয় কোনোদিন টেরও পেতাম না কী রকম ছাঁকা জ্ঞান নিয়ে মেতে আছি।

নরেন উৎসুক ও উৎসাহিত হয়ে বলে, আমায় কিছু খেতে দিয়ে তারপর বলুন। খিদেটা জুড়োলে আপনার কথা ভালো বুঝতে পারব। আমি অন্যভাবে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম।

মাধব মিষ্টি সুরে ডাকে, শুভা ? একটু শুনে যাও ?

বাইশ-তেইশবছরের একটি রোগা ছিপছিপে শ্যামবর্ণা মেয়ে ঘরে এসে বলে, কী কন ?

ম্লান বিষণ্ণ মুখ। ধীরতা স্থিরতার যেন প্রতিমূর্তি।

মাধব কেন ডেকেছে, সে কী বলবে শোনার জন্যই যেন সে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে—আর কিছুই সে দেখবে না, কিছুই সে শুনবে না—তার কোনো কৌতূহল নেই, কোনো সাধ নেই।

মাধব যেন আবেদনের সুরে বলে, এঁকে কিছু খেতে দিতে পার ? বাড়িতে কিছু আছে, না আনতে হবে ?

আছে।

সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে সুস্পষ্ট পদক্ষেপে শুভা ফিরে যায়।

নরেন বলে, খেয়ে নিয়ে তারপর বড়ো কথাটা ভালো করে শুনব। খিদেয় মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে—কী বলবেন হয়তো বুঝবই না। ইনি কে ?

সে যে এ প্রশ্ন করবে সেটা তো জানাই ছিল। মাধব নিজে থেকে শুভাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেও কোনো দোষ হত না।

মাধব বলে, রাঁধুনি রাখতে হল একজন, উপায় কী ?

উদ্‌বাস্তু মেয়ে না ?

বোধ হয় উদ্‌বাস্তু।

মাধব একনজর তার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, আপনি নানারকম কত কী ভাববেন মনে করে একটা কথা বলব না ভেবেছিলাম। মেয়েটি সত্যি ভালো। একবার যা করতে বলা হয় সব নিখুঁতভাবে করে যায়—দুবার বলতে হয় না। জগন্নাথবাবুকে একটা রাঁধুনির জন্য বলেছিলাম—উনি নিজে সঙ্গে নিয়ে এসে শুভাকে দিয়ে গেলেন। জগন্নাথবাবু চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন, শুভা ছাড়ল না। বলল—

শুভার ভাষায় তার কথাগুলি শোনাতে পারবে কিনা মনে মনে আওড়ায় মাধব। বোধ হয় হার মেনেই বলে, যাবেন না আপনি, সামনে থেকে কী কাজ করব না করব বোঝাপড়া করে দিন। খাওয়া-দাওয়া দিবেন, দশ টাকা বেতন দিবেন যে কাজ করনের লেইগা দিবেন আমি তা করুম। বাড়তি কিছু করুম না। আমার কাজ প্রাণ দিয়া করুম।

নরেন শুকনো গলায় বলে, আপনি সাধক মানুষ তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছি বাড়তি কাজ করার মানে বুঝেছিলেন তো ?

বুঝেছিলাম বইকী। আমাকে কি এতই বোকা ভেবেছেন ? জীবনে কোনো মেয়ের কাছে বাড়তি কাজ চাইনি—কোনোদিন চাইবও না।

সতেজে এ কথা ঘোষণা করে সানন্দে মাধব বলে, কিন্তু অন্যরকম বাড়তি কাজ শুভা নিজে থেকেই করছে। যতক্ষণ ভাত ফুটছিল, ইলার মাথায় নিজেই জলপটি দিয়েছে, হাওয়া করেছে।

নরেন বলে, বটে !

মাধব নিজের মনে বলে যায়, আমায় ডেকে বলল, এইবার মাছ তরকারি কাটুম ভাজুম রান্না করুম—আপনে খানিক জলপটি দ্যান। বরফ দিলে হইত না ? আইসব্যাগ নাই ? আপনাকে বলব কী ভাই, মাথাটা যেন গুলিয়ে দিল মেয়েটা। ঠিক কথা, ইলার মাথায় একটা আইসব্যাগ দিলে যে কাজ সব চেয়ে ভালোভাবে হয়—সেই কাজ আমি সারছি মাথায় জলপটি দিয়ে !

সখেদে আবার বলে, একটা মুখ্যু মেয়ের যেটা খেয়ালে আসে, আমার মতো মহাপুরুষ বিদ্বানের বুদ্ধিতে সেটা ধরাই পড়ে না।

নরেন সোজাসুজি প্রশ্ন করে, দিনরাত থাকে ?

মাধব বলে, পাগল হয়েছেন ? খাওয়াপরা দশ টাকা বেতনে দিনরাত থাকবে ? সকালে এসে রেঁধে বেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে এগারোটার সময় খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যায়। চারটের সময় এসে বিকালের রান্না সেরে খাবার নিয়ে বাড়ি যায়। সন্ধ্যার সময় আমি ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। রাত নটা-দশটার সময় এসে ছেলেমেয়ের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোয়।

নরেন চমৎকৃত হয়ে বলে, সে কী !

নরেন ভাবছিল মানসীর কথা। সে লোকনিন্দার কথা ভাবছে মনে করে মাধব বলে, লোকে কী ভাববে বলছেন তো ? ভাবলে কী করব ! ছেলেমেয়েগুলি একলা শুতে পারে না, ভয় পায়। সেই জন্য আমি বলেছিলাম, রাত্রে ওদের কাছে শুতে হবে। আমি নিজের কাজ করব না ওদের ভয় সামলাব ?

নরেন জোর করে কথা ঠেকিয়ে রাখে। কে জানে মানসীর উপর মাধবের এটা প্রতিশোধ কিনা !

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মাধব আবার জোর দিয়ে বলে, কথাটা খেয়াল করিনি ভাববেন না। জেনেশুনেই শুভাকে রাত্রে ছেলেমেয়েদের কাছে শুতে বলেছি। যার যা খুশি ভাবুক, আমি গ্রাহ্য করি না। মাইনে দিয়ে রাঁধাবাড়ার জন্য, ছেলেমেয়ে দেখবার জন্য যাকে খুশি রাখব—লোকের কী ? তাছাড়া, আমার তো মনে হয় না লোকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে।

নরেন তা জানে। দু-চারজন একটু হাসাহাসি করতে পারে, অল্পবয়সি ঝি রাঁধুনি রেখে ভদ্রলোকের বদনাম হয় না। কিন্তু মাধব কেবল লোকের কথাই বলছে—মানসীর কথাটা কি সত্যই ওর খেয়ালে আসেনি ?

ভুল বুঝে ফিরে এসে শুভার জন্যই মানসী আবার গটগট করে দিদির কাছে চলে গেলে তাকে যে দোষ দেওয়া যাবে না—এটুকু বাস্তববুদ্ধি কি তার নেই ?

অথবা সে যা ভাবছে তাই ঠিক ? জেনেশুনে মাধব প্রতিশোধ নিচ্ছে মানসীর উপর ?

আমি বউদির কথা ভাবছিলাম। মেয়েদের মন বোঝেন তো ? শুভা একেবারে ঝি-রাঁধুনি ক্লাসের মেয়ে হলে কথা ছিল না। বউদি জানলে চটে যাবেন।

মাধব উদাসভাবে বলে, যাবেন। আমি তার কী করব ? আমি যাকে পেয়েছি রেখেছি।

না, প্রতিশোধ নয়। মনের তলায় যাই থাক মাধবের, জেনে বুঝে প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বিশেষ করে শুভাকে বাখেনি। মানসী কী মনে করবে এটাই সে গ্রাহ্য করে না।

মাধবের অবজ্ঞা আন্তরিক। মোটা মাইনের চাকরি যার কাছে মানুষের চেয়ে মূল্যবান তাকে অবজ্ঞা না করে মাধবের উপায় নেই।

ইতিমধ্যে শুভা মামলেট ভেজে এনে দেয়।

নিঃশব্দে সেটা উদরস্থ করে এক গ্লাস জল খেয়ে নরেন প্রশ্ন করে, এবার বলুন তো কথাটা—বউদি চলে যাওয়ায় আপনার কী উপকার হয়েছে বলছিলেন ?

নিজেকে চিনতে পেরেছি, আমার জ্ঞানচর্চার ফাঁকিটা ধরতে পেরেছি। আমার জ্ঞানচর্চা করেই সুখ—সেটা জগতের কোনো উপকারে লাগল কী লাগল না সে জন্য ততটা আসে যায় না। জ্ঞানটা দিয়ে কী করব সে ভাবনা না ভেবেই পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছি।

মাধবকে নিয়ে মানসীর সঙ্গে সেদিনের আলোচনার কথা নরেনের মনে পড়ে। এদের রেশনটা এনে দিয়ে মাধবের বাজার করে ফেরার সময়টুকুর মধ্যেই মাধব সম্পর্কে তাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল—মাধব স্বার্থপর। তখন তার চাকরি ছিল।

চাকরিটা যদি আজও থাকত, মাধবের এই আত্মজ্ঞান জন্মেছে দেখে তার বোধ হয় খুশির সীমা থাকত না। কিন্তু চাকরি খুইয়ে হৃদয় মনের অনেক শিক্ষাই তার জুটেছে ইতিমধ্যে। খুশি হবার বদলে আজ তাই নানাপ্রশ্ন জাগে। খটকা লাগে যে মাধব কী সত্যই বাস্তবতার আলোয় তার আত্মকেন্দ্রিকতার স্বরূপ চিনেছে ? সেটাকে নিজের স্বার্থপরতা বলে মানতে পেরেছে ? অথবা ছাঁকা জ্ঞানচর্চার মতোই এটাও তার ছাঁকা জ্ঞান যে জ্ঞান দিয়ে কী করবে না জেনেই সে এতদিন জ্ঞানচর্চায় মশগুল হয়ে থেকেছে ?

নিজের জ্ঞানচর্চার বিষয়ে এই জ্ঞানটুকু নিয়েই কি সে খুশি থাকবে ?

শুধু তাই নয়। আত্মদর্শনে তার ভুল আছে কি না বিচার করবে না ? মানসীর জন্যই তার নতুন আত্মজ্ঞান জন্মালো অথবা বরখাস্ত হওয়াও এর একটা মূল কারণ—সেটা যাচাই করবে না ?

মাধব বলে, কী হল ? কথাটা তো সোজা, বুঝতে পারলেন না ?

নরেন বলে, বুঝেছি বইকী। কিন্তু শুধু বউদিকে দায়ি করবেন ? চাকরি খোয়ানোর হিসাবটা ধরবেন না ?

চাকরির হিসাব ধরেছি। মানসীই আসল কারণ। মানসী এ রকম ব্যবহার না করলে আমি কী করতাম জানেন ? রেগে দিল্লিতে কয়েকজনের কাছে কয়েকটা চিঠি আর একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিতাম। আমার জন্যই চাকরিটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল—আমার মতো অন্য কাউকে নেওয়া হয়ে থাকলেও আরেকটা চাকরি ক্রিয়েট করে আমায় নিত। ডিসমিসড হয়ে বাড়ি ফেরার সময় এই প্ল্যানটাই মাথায় ঘুরছিল।

নরেন বলে, রাগ করবেন না কিন্তু। আমি শুধু বুঝতে চাইছি। বুঝিয়ে না দিলে আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে যাবে। আপনি বলেছিলেন, দিল্লির চাকরি নেননি, এ চাকরিটা খোয়ালেন, এ জন্য বউদি রাগ করে চলে গেলে আপনার দুঃখ হত না। কিন্তু অন্যায় করে আপনাকে তাড়িয়েছে, আপনি ফাইট করে ওদের হুকুম বাতিল করাবেন—এ সব শুনেও বউদি চলে গেলেন বলে আপনার রাগ। দিল্লির চাকরি নেওয়ার প্ল্যান ভাঁজার সঙ্গে এ চাকরিটাব জন্য ফাইট করার প্ল্যান তো খাপ খায় না।

মাধব রাগ করে না। বরং খুশি হয়েই বলে, ইন্সটিঙ্কটিভলি মূল কথাটা ধরতে পারেন বলেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ভালো লাগে। কী ঠিক করেছিলাম জানেন ? দিল্লির চাকরির খাতিরেও এ চাকরিটার জন্য ফাইট বন্ধ করব না। এরা হুকুম ফিরিয়ে নেবে, স্বীকার করবে অন্যায় হয়েছিল, তারপর এখানে রিজাইন দিয়ে আমি দিল্লি চলে যাব। মানসী এটা হতে দিল না।

নরেনের ধাঁধা লাগছিল। তবু আর কথা না বাড়িয়ে সে বলে, এবার বুঝেছি। একটা বই দিন না ?

মোটা আর ভারী ওজনের একটা বই তাকে দিয়ে মাধব বলে, বুঝতে একটু কষ্ট হবে—তবু পড়ে ফেলুন।

বস্তির ঘরে ফেরাব পথে নরেন মানসীকে নতুন দৃষ্টিতে নতুনভাবে বিচার করার চেষ্টা করে।

মানসীর জন্য সমবেদনা থাকলেও তাকে নরেন তেমন পছন্দ করতে পারত না।

সে বরাবর জানে মাধবের দার্শনিক আদর্শপন্থী স্বার্থপরতা সত্যই অসহনীয় যে কোনো স্ত্রী ও মা-র কাছে।

ওই স্বার্থপরতা মেনে নিত বলে মানসীর উপর তাব বিতৃষ্ণা জাগত না।

স্বামীকে মানতে হলে, তার ও তার সন্তানের ভরণপোষণের মালিক ও দায়িক স্বামীকে মানতে হলে, তার আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চার স্বার্থপবতাকে না মেনে কোনো উপায় ছিল না মানসীর।

কারণ, এ রকম জ্ঞানচর্চা করে বলেই, সে এই ধরনের স্বার্থপর দার্শনিক বলেই, মাসে মাসে বেতনের নামে তাকে সাড়ে চারশো টাকা ঘুষ দিয়ে বশে রাখার প্রস্তাব আসে দিল্লি থেকে।

ঘুষ অথবা পুরস্কার অথবা মজুরি।

মাধবও খেটে খায় বইকী, বউ ছেলেমেয়েকে খাওয়ায় বইকী। সেকেলে ঈশ্বরের সাধকের মতো এই রকম জ্ঞানের সাধক সেজে, দিবারাত্রি এই জ্ঞানচর্চায় মেতে থেকে, সাধারণ মানুষের কাছে এই রকম জ্ঞানের বাজারদর বজায় রাখতে সাহায্য করছে বলেই তো মাসে মাসে তাকে সাড়ে চারশো টাকা দেওয়া সমীচীন মনে করে দিল্লির জ্ঞানীরা।

মানসীর আর্থিক উচ্চাশা এবং তার প্রতিক্রিয়া মাধবের মনে অসন্তোষ জাগিয়েছিল বলেই, অসন্তোষটা তার জানা-চেনা মানুষের কাছে আর সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল বলেই, দিল্লির চাকরির নিমন্ত্রণ সে পেয়েছিল।

মানসী এ সব না বুঝতে পারে। সে জন্য নরেন তাকে দোষ দেয় না।

কিন্তু সে কেন প্রশ্রয় দিত, নিজেকে সমর্পণ করত, নত হয়ে মেনে নিত দিল্লির সাড়ে-চারশো টাকার দাম কষা ? মাধবের জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতারও বাড়তি স্বার্থপরতা ?

তার পাগলামি করার স্বার্থপরতা ?

আগে জানত না। এখন নরেনের যেন মনে হয়, সে আগেই জানত মাধবের চাকরি গেছে শুনলেই মানসী তাকে আখের চিবানো ছোবড়ার মতো ত্যাগ করবে।

নত হয়ে মাধবের অসহনীয় স্বার্থপরতা সইতে সইতে আসছিল বলেই তো মাধবের চাকরি হারানোর ধাক্কায় ফেটে পড়তে হল—গটগট করে চলে যেতে হল দিদির কাছে। আগে থেকে প্রয়োজনেরও বেশি না মানলেই হত মাধবের স্বার্থপরতা ? এ রকম চরম বোঝাপড়ার বদলে মাধব বাড়াবাড়ি করলে রেগে উঠলেই হল যে সে বাড়াবাড়ি সইবে না ? মাধব সংযত হত।

আজ মাধব যা বুঝেছে আগেই তাহলে সেটা খানিক খানিক বুঝত। এভাবে জমানো রাগ ফেটে গিয়ে দিদির কাছে ছুটতে হত না মানসীকে।

৯

নরেন জানে, মাধব তাকে বাঁচাতে পারবে না।

চাকরি খুইয়েও মাধব যে নিজের দুবছর ধরে খেটেখুটে লেখা বই নিজে ছাপাতে চায়, বইটার প্রেসকপি তৈরি করে প্রুফ দেখার জন্য তাকে দু-চারটাকা দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে চায়—এর মধ্যেই আছে মাধবের বাস্তববুদ্ধির অভাবের বাস্তব পরিচয়।

এত বড়ো জ্ঞানী, জ্ঞান দিয়ে জগৎসংসারটাকে জেনে ফেলেছে, বুঝে গিয়েছে বস্তু এবং শক্তির মানে, সম্পর্ক ও মর্মকথা—কিন্তু সে এই ছোটো সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানটা চাকবি হারিয়েও অর্জন করতে পারছে না যে সে জ্ঞানী হলেও দাস।

এই দাসত্ব ঘুচিযে সকলের এগোনো ছাড়া, শিক্ষা সভ্যতা বাড়ানো ছাড়া, সুন্দর সুস্থ আনন্দময় জীবন চাওয়া ছাড়া মানেই হয না তার বা অন্য যে কোনো মানুষের জ্ঞান নিয়ে মেতে থাকার।

মানুষকে এড়িয়ে মনুষ্যত্বকে এড়িয়ে মাধব চায় মানুষের জ্ঞানের সম্পত্তি একা দখল করে একচেটিয়া কারবার করতে।

বস্তিতে চারজন অশিক্ষিত জীবিকা-কামীদের সঙ্গে একটা খোলার ঘরে গাদাগাদি করে নরেন বাস করে। কোনো বেলা অন্ন জোটে কোনো বেলা জোটে না, এক মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে পরের মাসের ভাড়া গুনতে পারবে কি না জানা থাকে না।

তবু মনে হয় এটাই ভালো। কী হবে না হবে কিছুই ঠিক না থাকলেই কিছু হওয়ানোর জন্য করানোর জন্য ঝোঁক আসে, জিদ চাপে।

গ্র্যাজুয়েট যুবক একটা চাকরি পেলেই শেষ হয়ে যায় মানুষ হিসাবে তার অন্য সব কিছু পাওয়ার ঝোঁক,—চাকরি করে কোনোবকমে বেঁচে থাকতে পারলেই যেন জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।

মাধবের কঠিন—অতি কঠিন বইটার এগারো নম্বর ফর্মার প্রুফ মাধবের দেওয়া মোটা ডিকসনারিটার বানানের সঙ্গে সাবধানে মিলিয়ে দেখতে দেখতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল নরেনের।

চোখের দোষ ছিল না, দিনের আলোই ঝাপসা হয়ে এসেছে।

ডিম-ভরা একটা তারের ঝুড়ি হাতে নিয়ে মণ্টু ঘরে ঢুকতে নরেনের ধৈর্য আর মনোযোগ দুই-ই শেষ হয়ে যায়।

দীননাথ এখনও কাজ বাগাতে পারেনি, অন্য একটি ছেলের দেখাদেখি মণ্টু ঘুরে ঘুরে ডিম বেচা শুরু করেছে।

গোটা দুই কাঁচা খেতে দিবি মণ্টু ? কাঁচা ডিম খেলে গায়ে জোর বাড়ে।

দাম দিলে দুটো কেন দশটা দিতে পারি।

দুটো ডিম কত দিয়ে কিনলে তোর ক-পয়সা লাভ থাকবে ?

বড়ো মাদ্রাজি পাঁচ আনা জোড়া কেনেন, ছোটো দেশি সাড়ে চারআনা জোড়া কেনেন, দু-পয়সা বাগাবই।

মোটে দুপয়সা ?

পঞ্চাশ দুপয়সায় কম হল নাকি ?

নরেন আশ্চর্য হবার ভাণ করে বলে, তাই তো পঞ্চাশ দুপয়সা ! ও বাবা সে যে অনেক পয়সা রে—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একশো পয়সা ! পুরো এক টাকা ন আনা ! খুব লাভের ব্যাবসা ধরেছিল তো মণ্টু !

তার হালকা সুরের হালকা কথায় মণ্টু আহত হবার বদলে খুশিই হয়। আজ দিন তিনেক সে শুরু করেছে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ডিম বেচার ব্যাবসা অথবা কাজ। ব্যাবসা এটা নয়—বাজার থেকে চাকর দিয়ে ডিম আনার সাধ্য যাদের নেই, চাকরই যাদের নেই—তাদের বাজার থেকে ডিম কিনে আনবার চাকরের কাজটাই সে করে দেবে সস্তায়।

এটা হিসাব করেই নরেন হালকা সুরে কথা বলেছিল। মণ্টু যে অনেক দূরের বাজারে হেঁটে গিয়ে পাইকারি দরে ডিম কিনে এনে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে ডিম বেচে দুটো পয়সা রোজগার করছে—এটা সে আগেই টের পেয়েছিল।

গত দুদিন সে কাগজের ঠোঙায় কয়েকটা ডিম আনত কাগজের ঠোঙাতেই ডিম নিয়ে ফেরি করতে যেত।

আজ তারের ঝুড়িতে সে একেবারে পঞ্চাশটা ডিম এনেছে। ডিম বেচে লাভ করা যায় এটা হাতেনাতে না জেনে সে তার ব্যাবসা এতখানি বাড়াতে সাহস পেত না।

এতগুলো বেচতে পারবি ?

পারব। কিন্তু পচা ডিম বেরিয়ে যায়। ওদিকে বেছে আনতে দেবে না—এদিকে পচা ডিম বদল দেবার কড়ারে ছাড়া লোকে কিনবে না—লাভটা খেয়ে দেয় পচা ডিমে।

এটা সমস্যা বইকী। ডিম ফেরি করার সব চেয়ে বড়ো সমস্যা। তবু এই সমস্যাটাকে পর্যন্ত জয় করে মণ্টু কয়েক আনা লাভ করছে—যে পয়সায় একবেলা খেয়ে, আধপেটা খেয়ে একটু খাদ্যের সঙ্গে বেশি অখাদ্য মিশেল দিয়ে খেয়ে—মণ্টু কোনোরকমে বেঁচে থাকতে পারবে।

নরেন ভাবে, ডিমের ব্যাবসায়েও কি ওই এক নিয়ম ?

ছোটোবড়ো ডিম, পচা ডিম বেছে আনতে না দেওয়ার কায়দায় মণ্টুর লাভ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে সারাদিনের মজুর খাটার দামে ? মণ্টু ডিম এনে সারাদিন দুয়ারে দুয়ারে বেচে লোকসান দেবে না—একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট সম্বল করে একবেলা আধপেটা খাদ্য আর দুপয়সার চীনা বাদাম চানাচুর খেয়ে যথারীতি মণ্টু বেঁচে থাকবে ?

এভাবে বেঁচে থাকার জন্যই চালিয়ে যাবে ডিম বেচার মজুরগিরি ?

মণ্টু একেবারে মরে গেলে সে তো আর পাইকারি ডিম কিনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেচতে পারবে না।

ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে মণ্টু যাতে ডিম বিক্রি করতে পারে সে হিসাবেই ঠিক হয়েছে ডিমের দর, শতকরা পচা ফেরতের নিয়ম, ডিমের দরের তারতম্য ?

সে আরও কিছু বলবে কিনা সে জন্য অপেক্ষা না করেই মণ্টু ডিমগুলি সামলে রাখার চেষ্টা শুরু করেছে দেখে নরেন ভারী খুশি হয়।

পৃথিবীর সমস্ত গরিব মানুষের বাঁচার নিয়মকে মণ্টু যেন সম্মান দিচ্ছে তার পাইকারি দরে কিনে আনা ডিমগুলি ঠিকঠাক সামলে রাখার চেষ্টা দিয়ে—যাতে ভোর ভোর বেরিয়ে চারিদিকে সমস্ত এলাকা ঘুরে এই পঞ্চাশটা ডিম বিক্রি করা শুরু করা চলে।

তখন আসে নন্দন।

অন্য বেশে, অন্য এক নন্দন।

নতুন ধুতি নতুন জামা তার ভাগ্যে জুটেছে কদাচিৎ। বরাবর সে হেমেন্দ্র আর গোবিন্দের পুরানো ধুতি আর জামা পেয়ে কোনোরকমে চালিয়ে দিয়ে এসেছে।

আজ তার পরনের ধুতি আর পাঞ্জাবির নতুনত্ব তাকালেই চোখে পড়ে। ধুতিটা বোধ হয় একবারের বেশি ধোপ খায়নি—কোরাত্বের ছাপ রয়ে গেছে। পাঞ্জাবিটা আনকোরা—ঘরে হয়তো একবার সাবানকাচা করা হয়েছে।

নন্দনের চোখেমুখেও একটা নতুন ভাবের ছাপ।

চাকরি পেয়েছিস, না ?

পেয়েছি। গোবিন্দ চাকরি করে দিয়েছে।

কথা আর বলার ভঙ্গি থেকেই নরেন টের পায় গুরুতর কিছু ঘটেছে।

সেদিন মাধবের কাছে পেটের দুরন্ত খিদেয় ঝিমিয়ে পড়ার গুরুত্ব নিয়ে গিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার আগে যেমন অস্থিরতা বোধ হয়েছিল, আজ অবিকল তেমনই ব্যাপার ঘটে।

সে বোধ করে কিছু না খেয়ে বন্ধু ও তার আপনজনের জীবনে গুরুতর ব্যাপার ঘটার বিবরণ শোনার সাধ্য তার নেই।

একটু থাম। খিদেয় গা গুলোচ্ছে। ক-টা পয়সা দে—কিছু আনিয়ে খাই। তারপর শুনব।

নন্দন বন্ধুর মুখের দিকেও তাকায় না। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, দাঁড়া আসছি।

দু-চারপয়সায় খাবার আনতে বেরিয়ে গিয়ে সে কত যে দেরি করে ফিরে আসতে !

নরেনের মনে হয়, আর বুঝি সে ফিরবে না—তার গুরুতর কথার চেয়ে খিদেকে বড়ো করায় বন্ধু বুঝি রাগ করেই চলে গেল !

নন্দন ফিরে আসে দুভাঁড় গরম দুধ আর দুখানা টোস্ট নিয়ে।

নরেন ধাতস্থ হয়। ঠিক কথা—জগৎ নিয়মে চলে। দুমুঠো মুড়ি খেয়ে দিনটা তাকে পাত করতে হচ্ছিল বলেই কি নিয়ম পালটে যাবে জগতের ?

দুটি পয়সায় মুড়ি খেয়ে কালাচাঁদের দলে যোগ দেবার শুধু ইচ্ছাটা প্রকাশ করেই রুটিমাংস পেট ভরে খেয়ে আসার তাগিদ সে যে রুখেছে, সেটা কখনও ব্যর্থ হতে পারে ?

সে অবশ্য ভেবে পায়নি, আজকেই তার এক ভাঁড় দুধ আর একখণ্ড টোস্ট জুটে যাবে।

কিন্তু সে ভেবে পায়নি বলেই কি এটা অনিয়ম ?

নিয়ম কি তার ভাবনার তোয়াক্কা রাখে ?

বেশ গরম ছিল দুধটা। বেশ মচমচে ছিল টোস্টটা।

একেবারে রাজভোগ !

কী ব্যাপার বল তো এবার শুনি ?

গোবিন্দ স্যুইসাইড করেছে।

দুই বন্ধু নির্বাক হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে। ঘরে অন্ধকার গাঢ় হয়—পরস্পরকে তারা দেখতে পায় না। পরস্পরের মুখ দেখার সাধও তাদের হয় না।

গোবিন্দ আত্মহত্যা করেছে !

শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নয়, অনেক দিক দিয়ে বিভ্রান্ত গোবিন্দ।

তা এ রকম বিভ্রান্তেরাই তো আত্মহত্যা করে।

কী বিষম নীতি এতকাল পালন করে এসেছে তার বাড়ির লোকেরা—কী রকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক নীতি ! নন্দনকে চাকর করে রেখে তাকে ঘরের ছেলে হয়ে থাকার সব রকম অধিকার দেওয়ার নীতি ! মাস্টার অব আর্টস হয়েও নন্দন আজ এতকাল বেকারির বোঝা বইতে পেরেছে, দোকানটা নষ্ট হওয়ার ধাক্কায় ক-মাসে কাবু হয়ে গোবিন্দ আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ল !

এ সব স্থায়ী কারণ—একটা বিশেষ অবস্থায় পড়লে লড়াই করার বদলে আত্মহত্যার ঝোঁক চাপার কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণও কিছু একটা ছিল নিশ্চয় ?

বাড়িতে রাগারাগি হয়েছিল, না ? ঝগড়াঝাঁটি খোঁচা দেওয়া টিটকারি এ সব শুরু হয়েছিল তো ?

নন্দন মাথা নাড়ে।

ও সব বিশেষ হয়নি। রাগারাগির বদলে সবাই আপশোশ আর হা-হুতাশটাই বেশি করে এসেছে।

সেটা সোজা টিটকারি নয়। শুনতে শুনতে গোবিন্দ নিজেকে বেশি বেশি ধিক্কার দিত, বেশি বেশি অপমান বোধ করত।

ঝগড়া একটা হয়েছিল—ছবির সঙ্গে।

ছবির সঙ্গে ?

নরেন সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়। ছবিরাণী তো মোটেই ঝগড়াটে মেয়ে নয়—সে তো কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না !

নন্দন বলে, ছবির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বেধেছিল। আমিও লক্ষ করছিলাম, কিছুদিন থেকে ছবি কী রকম ছটফট করে বেড়াচ্ছে—হ্যাঁরে, ছবির সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল ?

নরেন সায় দিয়ে বলে, হয়েছিল। ছবির হিসেব খুব সোজা—আমার কোনো দিন চাকরি-বাকরি হবে না। কাজেই বাপ-দাদার ঘাড়ে পড়ে থাকার চেয়ে যা জুটছে তাই মেনে নেওয়া ভালো। একজনেরটা খেয়েপরে বাঁচতে হবে তো ওকে।

নন্দন গম্ভীর মুখে বলে, ও ! এবার বুঝেছি। তুই চাকরির চেষ্টা করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিস, চাকরি না বাগিয়ে বাড়ি ফিরবি না,—এ খবরটা শোনার পরেই ছবির ছটফটানি শুরু হয়।

ছবিরাণীর ছটফটানি। অন্য সময় হয়তো এ বিষয় আরও কিছু শুনবার সাধ নরেনের হত, আজ কিন্তু ছবিরাণীর প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে সে কেবল গোবিন্দের কথা শুনতে চায়।

কী নিয়ে ওদের ঝগড়া হল ?

কিন্তু গোবিন্দের কথাতে ছবিরাণীর কথাও আসে।

নন্দন বলে, কোথাও কিছু নেই ছবি হঠাৎ জিদ ধরল, বিয়ের তারিখ দু-তিনমাস পিছিয়ে দিতে হবে। কেন দিতে হবে ? না, তাড়াহুড়ো করে একজন আজেবাজে লোকের হাতে তাকে সঁপে দেওয়া হচ্ছে—তা চলবে না। এটা হাতে থাক—কয়েকটা মাস দেখা যাক। ইতিমধ্যে গোবিন্দ নিশ্চয় কিছু

করতে পারবে—তার মন বলছে পারবে। কাজেই এ রকম দূর দূর করে তাকে তাড়াতে হবে না। গোবিন্দ ভাবল ছবি বুঝি তাকে খোঁচা দিচ্ছে, টিটকারি দিচ্ছে—দোকান খুইয়ে বোনটাকে পর্যন্ত যার তার কাছে বলি দেবার কথা বলছে। ছবি যত বলে যে গোবিন্দ নিশ্চয় কিছু করতে পারবে—গোবিন্দ তত চটে যায়। তারপর ছবিও গেল রেগে।

নন্দন একটু চুপ করে থেকে অন্য সুরে বলে, ছবিকে আমি কোনোদিন এ রকম বাগতে দেখিনি। বড়োভাই—তাকে যা মুখে এল বলতে লাগল, শাপতে লাগল। তারপর মাথা খারাপ হয়ে গেল ছবির মা-র—গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। একবার ছবিকে গাল দেয়, একবার গোবিন্দকে গাল দেয়। তুই তো জানিস ছবির মাকে, বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

নরেন ধীরে ধীরে বলে, কীভাবে—?

বিষ খেয়ে। ছবির মা মুখ খুলতে হঠাৎ গোবিন্দ কেমন চুপ হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে জামা-টামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সকলেব একটু ভয় করতে লাগল—কিছু না করে বসে। রাত্রে বাড়ি ফিরল, শুধু একটু গুম খাওয়া ভাব, আর কিছু নয়, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রে ঘুমোতে গেল। তারপর রাত্রে কখন উঠে বেরিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। শেষরাত্রে পুলিশ এসে ডাকাডাকি, নগেন আর বিপিনের বড়ো কাপড়ের দোকানের সামনে গোবিন্দ মরে পড়ে আছে—নাম ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

এ কী নাটক ? কী মানে এই সাধারণ পরিবারের সাধারণ একটা ছেলের সাধারণ ভোঁতা জীবনের এই নাটকীয় পরিণতির ?

নরেনের মনে হয় সাধারণ মানুষের জীবন যত অসাধারণ নাটকীয উপাদান এবং ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় ঠাসা হযে আছে, দু-চারটে এই রকম ফেটে-পড়া নাটকীয় ঘটনা তারই ঘনীভূত নমুনামাত্র।

গোবিন্দ চাকরি করে দিয়ে গেছে বলছিলি ?

হ্যাঁ, গোবিন্দের জন্যই আমার চাকরি।

চিঠিতে গোবিন্দ প্রথামত লিখে রেখে যায়নি যে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয়। বরং মৃত্যুর জন্য অতি পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় নগেন আর বিপিনকে দায়ি করে গেছে। ওরা ঠকিয়ে তার দোকানটা নিয়েছে, তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে।

পরের ঘটনা জানত না তাই নরেন বলে, ছেলেমানুষি বুদ্ধি তো। ভেবেছে এ রকম চিঠি লিখে রেখে গেলেই নগেন আর বিপিন খুব জব্দ হয়ে যাবে। পুলিশ একটু হয়রানও তো করেনি ওদের ?

নন্দন বলে, তা করেনি—শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু গোবিন্দের সবটাই কি ছেলেমানুষি বুদ্ধি ছিল ? সত্যই কি বেচারা জানত না এ রকম চিঠি লিখে রেখে গেলেও পুলিশের হাতে ওদের কিছু হবে না ? আমার মনে হয় জানত। ছেলেমানুষি ছিল চূড়ান্ত রকম—সেটা বাড়ির লোকের দোষ। কিন্তু এদিকে চালাকও কম ছিল না ছেলেটা। ও রকম চিঠি লিখে গেলে, ওদের দোকানের সামনে গিয়ে মরলে ওরা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে জব্দ হবে—ঠিক এটা গোবিন্দ চায়নি। সে চেয়েছিল এই ব্যাপার নিয়ে একটা হইচই হবে, সবাই ওদের ছিছি করবে। নিজে বিষ খেলেও, ওদের জন্যই তো তাকে বিষ খেয়ে মরতে হয়েছে—এটা জানাজানি হয়ে যাবে। হলও ঠিক তাই। নানালোকে নানাকথা বলতে লাগল, টিটকারি দিতে লাগল। কতকগুলি ছেলে সুযোগ পেলেই মারধোর করবার তালে ফেরে, ঢিল-টিল ছোঁড়ে, দোকানের সামনে প্ল্যাকার্ড এঁটে দেয়—আরও কত কাণ্ড। একদিন রাত্রে দোকানের মধ্যে কারা কতগুলি পটকা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

নরেন বলে, বড়ো রাস্তায় দোকান, সব সময় কত লোকজন। পটকা ছুঁড়ে কি আর পালিয়ে যেতে পারত? ওরাই চুপচাপ থেকেছে—নতুন হাঙ্গামা করতে চায়নি।

মধ্যস্থ স্থানীয় কয়েকজন ব্যাপারটা নিয়ে তারপর একটু আলোচনা করেছিল নগেন ও বিপিনের সঙ্গে। তাদের দোষী করা নয়, দায়ি করা নয়, দাবিদাওয়ার কথা নয়—তবে ছেলেটা এভাবে মরল, বুড়ো হেমেন্দ্র বহুকাল কাপড়ের ব্যাবসায়ে ছিল, বাড়ির লোকের অবস্থা বড়ো কাহিল—তারা বরং উদারভাবে নন্দনকে একটা কাজ জোগাড় করে দিক।

ওই ক-জন নিজেরা যেচে মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিল কিনা নন্দন জানে না, নগেনরাই হয়তো বেগতিক দেখে ওদের মধ্যস্থ করেছিল।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিল। হ্যাঁ, কাজ একটা নন্দনকে তারা দেবে। এটুকু না করলে চলবে কেন ? একটা পরিবারকে তো না খেয়ে মরতে দেওয়া যায় না !

এদিকে গোবিন্দের কথা ভেবে নন্দনের প্রাণটা হুহু করে। ওই নগেনদের কাছেই শেষ পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হবে—গোবিন্দের প্রাণের মূল্য দিয়ে জোগাড় করা কাজ ?

কিন্তু মুখে সে কিছু বলেনি।

বাড়ির লোকে যা বলবে সে তাই করবে !

ওরা যদি চায় সে কাজটা করুক, ওরা যদি পারে এই চাকরির টাকার ডালভাতে পেট ভরাতে—তার কোনো আপত্তি নেই।

সে তো নিজের জন্য চাকরিটা নেবে না।

ছবিরাণী বলেছিল, না, তা হবে না। ওদের কাছে তুমি চাকরি নিলে আমিও বিষ খাব, নয় গলায় দড়ি দেব।

বলে সে কেঁদে ফেলেছিল। গোবিন্দের জন্য তখন সকলের শোকটাই টাটকা।

হেমেন্দ্র বলেছিল, না। এ কাজ নেওয়া যায় না। চল তো নন্দন আমরা একবার বেরোই।

নন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হেমেন্দ্র গিয়েছিল চেনা একজন বড়ো ব্যবসায়ীর কাছে। তার নাম রাধারমণ। মোটামুটি ব্যাপার জানা ছিল সকলেরই, খুঁটিনাটি আরও। সব বিবরণ জানিয়ে হেমেন্দ্র বলেছিল, এ অনুগ্রহ নেওয়া যায়, আপনারাই বলুন ? আপনারা একটা ব্যবস্থা না করলে তো উপায় নেই আর।

নগেন ও বিপিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাধারমণ সঙ্গে সঙ্গে নন্দনকে একটা কাজে বহাল করেছিল।

চাকরিটা গোবিন্দের জন্যই। নইলে কাজ দেবার গরজ কি হত রাধারমণের ? নগেন ও বিপিন সর্বনাশ করেছে দাদুর, তার নাতিটাকে দিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়েছে—সে তাড়াতাড়ি একটা কাজ দিল নন্দনকে। লোকে দেখুক ওরাও কেমন লোক, রাধারমণই বা কেমন লোক—তুলনা করুক।

কী করতে হয় ?

হিসাব দেখা থেকে অনেক কিছু। বিশেষ বিশেষ পার্টির সঙ্গে দেখা করতেও পাঠায়—যাদের কাছে এম এ পাস করার একটু মর্যাদা আছে।

লণ্ঠনের আলোয় দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে থাকে।

নরেনের মনে পড়ে তার চাকরি হবার পর দুই বন্ধু তারা তফাতে সরে গিয়েছিল। হিংসায় নয়, বিবাদ করে নয়—একজনের চাকরি করার এবং আরেকজনের বেকারি করার দায়ের জন্য।

আপিসে একটা চাকরি খালির খবর নিয়ে অনেকদিন পরে নন্দনের কাছে গেলে সে বেশ একটু জ্বালাও প্রকাশ করেছিল বন্ধুর অবহেলায়।

আজ আবার অনেকগুলি দিনের অদর্শনের পর নন্দন তার কাছে এসেছে চাকরি পাওয়ার খবর দিতে।

কিন্তু কী নিদারুণ সুসংবাদটা ?

নন্দন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমাদের আসল দোষ কী জানিস? জীবনযুদ্ধটা বড়ো একা একা চালাই। তোর যুদ্ধ তোর, আমার যুদ্ধ আমার। একসঙ্গে যদি লড়াই চালাতাম—

তাও চালাচ্ছি বইকী। আমাদের তেরোজনের জন্য একমাসের ওপর আপিস বন্ধ ছিল, সাতজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। আমরা ক-জন বাদ পড়লাম অল্পদিন কাজ করেছি বলে, দীননাথেরও একটা কাজ জুটে গেছে।

গোবিন্দের নাটকীয় আত্মহত্যা নিয়ে হইচই পড়ে গেলে ব্যবসায়ী সমাজের মুখরক্ষার জন্য নগেনরাই এগিয়ে এসেছিল নন্দনকে কাজ দেবার জন্য।

গোবিন্দ রেখে গিয়েছে বুকের মধ্যে কাঁচা ঘা, নন্দনেরা ইতস্তত করেছিল এই উদারতার অপমান গ্রহণ করতে।

রাধারমণ খুশি হয়ে তাদের মান রেখেছে, বলামাত্র নন্দনকে কাজ দিয়ে অর্জন করেছে ব্যবসায়ী সমাজের মুখরক্ষার গৌরব।

কেবল নন্দনকে নয়।

দীননাথকেও সে কাজ দিয়েছে।

বলেছে, গোবিন্দের দোকানে যারা খাটত তাদের সবাইকে আমি কাজ দেব—না থাক আমাব লোকের দরকার, হোক আমার লোকসান। টাকাটাই বড়ো নাকি জগতে ? ঢের টাকা কামিয়েছি, ঢের টাকা কামাব—তাই বলে নিজের মনুষ্যত্বকে বিক্রি করব নাকি টাকার কাছে ?

বলেছে, আরেকটা কে ছোকরা কাজ করত শুনলাম গোবিন্দের দোকানে ? তার কেউ পাত্তা জানো ? খোঁজ পেলে ওকেও ডেকে এনো—ওকেও আমি কাজ দেব।

তার মহানুভবতার মানে বুঝতে অবশ্য কারও দেরি হয়নি।

মৃত গোবিন্দের জন্য সে যত করবে ততই দশজনের কাছে তাব গৌরব—ততই নগেন আব বিপিনের অপমান বদনাম !

নামটাই সকলে জানত—ভোলা। কোথা থেকে জুটিয়ে এনে গোবিন্দ ওকে দোকানের কাজে লাগিয়েছিল কেউ জানে না—গোবিন্দ বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিত নামহীন গোত্রহীন ছোঁড়াটাকে।

দোকানেব মালিক বলে গোবিন্দকে যেন গ্রাহ্যই করত না ছেলেটা। বেঁটে মোটাসোটা বেপরোয়া ছেলে—ট্যাবা ট্যাবা গালে বসন্তের দাগ।

মাসে দুবার তিনবার সে কাজ ছেড়ে দিতে চাইত রুখে উঠে, গোবিন্দ নরম হয়ে তোষামোদ করে তার চাকরি বাঁচিয়ে দিত।

দু-চারটে যোগসূত্র বোধ হয় জানা ছিল দীননাথের—একই দোকানে উদয়াস্ত বালক ও প্রৌঢ় দুজনেই তারা তো করত জীবিকা অর্জন !

সূত্রগুলি ঘেঁটে ভোলাকে খুঁজে বার করার ইচ্ছা নন্দনের কেন হয়েছিল সে নিজেই জানে না।

প্রথম সূত্রই তাকে নিয়ে যায় এক ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নের দোকানে।

ঝাঁঝরায় কড়ায়ের ঘি থেকে সিঙ্গাড়া ভেজে তুলতে তুলতে শ্রীকান্ত চক্রবর্তী বলে, ভোলা ? ভোলা ফিরে গেছে মা-র কাছে।

চেঁচিয়ে বলে, তোরা কেউ জানিস নাকি ভোলার ঠিকানা ?

জোয়ানবয়সি যে লোকটা খাবার বেচছিল সে পুবের শহরতলির একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, ওখানে পাবেন ছোঁড়ার মা-টাকে। ছোঁড়াকে একবার আসতে বলবেন তো মশায়।

ঠিকানায় গিয়ে নন্দন জেনেছিল, ভোলা আর তার মা দুজনেই একদিনে কলেরায় স্বর্গে চলে গেছে।

খবর শুনে দীননাথ ভেবেছিল, ভোলা যখন স্বর্গেই গেছে, ভোলাকে কাজ দিতে চেয়েও যখন কিছুতেই তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না—কাজটা মণ্টুকে দিলে দোষ কী হয় ?

প্রস্তাব শুনে রাধারমণ বলেছিল, তুমি তো বড়ো ছ্যাঁচড়া লোক হে ? তোমায় নিলাম তাতে খুশি নও ? ছেলেটাকেও ঢোকাতে চাও ?

দীননাথ সবিনয়ে বলেছিল, একটা ছেলেকে কাজ দিতে চাইলেন। ছেলেটা স্বগগে গেছে। মোর ছেলেটা বসে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে। তাই বলছিলাম।

রাধারমণ উদারভাবে বলেছিল, সোজা কথাটা বোঝ না কেন বল দিকি ? কাজ কি আমার দেবার ছিল, লোক নেবার দরকার ছিল ? নন্দন আর তোমাকে দিয়েছি বাড়তি কাজ—তোমাদের ছাড়াই আমার কারবার চলে। কিন্তু কী করি বলো, দশজনা চাইছে, কাজ তোমাদের দিতে হল। বেঁচে-বর্তে থাকলে ভোলাটাকেও কাজ দিতে হত। তাই বলে তোমার ছেলেটাকেও আমার ঘাড়ে চাপাবে ?

১০

সে যে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যায়নি, ও রকম ছেলেমানুষি অভিমানের ধার যে সে ধারে না, এটা প্রমাণ করার জন্য নরেন দু-চারদিন পরে পরেই বাড়ি গিয়ে সকলের খবর নিয়ে আসে।

বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

বাড়ির আপন মানুষগুলিকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না !

তার সঙ্গে সকলের কথা ও ব্যবহারে এমন একটা কৃত্রিমতা এসে যায়, এমন একটা আড়ষ্টভাব সকলে দেখায় যে কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকতেই নরেনের যেন দম আটকে আসে।

এর চেয়ে ছেলেমানুষি রাগ আর অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই বরং ভালো ছিল, দেখা করতে এলে মা বাবা ভাইবোন খানিকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারত, এ রকম বিব্রত হওয়ার বদলে তার রাগ ভাঙাবার চেষ্টা করতে পারত।

বাড়ির লোক তার সঙ্গে কেন এ রকম করে নরেন তার কারণটা বোঝে। কিন্তু সেটা এমন একটা কারণ যে প্রতিকারের উপায় ভেবে পায় না।

সে রাগ করে যায়নি, না ডাকতেই এসে আপনজনের খবর নিচ্ছে, সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে, এটা ওটা খেতে দিলে খাচ্ছে—দেখাচ্ছে যেন খাপছাড়া কিছুই ঘটেনি—তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা অতি সাধারণ তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

এর ফলে সকলে যেন অপরাধী বনে গিয়েছে তার কাছে। সে যাই বলুক আর যাই করুক, তাদের খারাপ ব্যবহারেই যে তাকে বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে—এই সত্যটা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে।

তারা করেছে ছোটোলোকামি—কিন্তু সেটাও নরেন উদারভাবে ক্ষমা করেছে ! তাদের জন্য পরের মতো বস্তিতে গিয়ে বাস করতে হলেও পর সে তাদের পর করে দেয়নি, নিজে পর হয়ে যায়নি।

কেবল দেখিয়ে দিয়েছে তারা কত সস্তা মানুষ, কত ছোটো তাদের মন।

এই অপরাধের বোধটাই সকলের কথা ও ব্যবহারে আড়ষ্টতা এনে দেয়, প্রাণ খুলে সহজভাবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

উষা একদিন খুব ভয়ে ভয়েই একটা প্রস্তাব জানায়। নরেন টের পায় কথাটা তার নিজের মাথায় গজায়নি—মা-বাবাই কথাটা ভেবেছে এবং পরামর্শ করে নিজেরা না বলে উষাকে দিয়ে তাকে বলাচ্ছে।

উষা বলে, তুমি এক কাজ করলে তো পার দাদা ? তুমি বাড়িতে থাকলে তো কোনো বাড়তি খরচ নেই—সেই বাড়িভাড়া গুনতেই হবে। বাড়িতে এসে থাকো, ওখানে যেমন নিজের সব ব্যবস্থা নিজে করছ এখানেও তাই কর। আমাদের এ রকম বিশ্রী লাগবে না।

বিশ্রী লাগবে না ? আরও বেশি বেশি লাগবে।

তুমি বুঝছ না। এখন কীরকম হয়েছে জানো ?—আমরা যেন তোমায় বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি। লোকে বলছেও তাই। বাড়িতে থাকলে আমাদেরও ও রকম মনে হবে না, লোকেও কিছু বলতে পারবে না।

মেয়ের কথায় সায় দিয়ে মা ব্যগ্রভাবে বলে, ঠিক কথাই তো। তুই বলছিস রাগ করিসনি, রাগ করে বাড়ি ছাড়িসনি। তবে বাড়িতেই এসে থাক—ওখানে যেমন ব্যবস্থা করে খাচ্ছিস, এখানে তেমনি করবি।

নরেন শান্তভাবে বলে, তা হয় না।

উষা বলে, তার মানে তুমি রাগ করেছ সত্যিই, দেখাচ্ছ যে রাগ করনি। একবাড়িতে আমাদের সাথে তুমি থাকতে চাও না।

কেন সে বস্তির ঘর ছেড়ে এখানে এসে থাকতে রাজি নয় তার কাবণটা নরেন বলবে না ভেবেছিল কিন্তু এবার না বলে উপায় থাকে না।

একটা কথা হিসেব করছিস না। একবেলা খেয়ে, চাট্টি মুড়িচিড়ে খেয়ে, কোনোদিন কিছু না খেয়ে আমাকে দিন কাটাতে হয়।'এখানে এসে আমি না খেয়ে থাকব—তোরা খাওয়া-দাওয়া করবি—আরও বিশ্রী লাগবে না সেটা ?

তারা চুপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে গেলে আরও বেড়ে গিয়েছিল সকলের বিব্রতভাব, কথাবার্তার কৃত্রিমতা।

তারা তাকে শুধু বস্তির ঘরেই তাড়ায়নি, তাদের জন্য সে আধপেটা খেয়ে, উপোস করে দিন কাটায় ! তার কাছে নিজেদের আরও বেশি অপরাধী মনে হয় সকলের।

কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাঝে মাঝে এভাবে বাড়িতে খবর নিতে না গেলে সন্ধ্যার ব্যাপারটা জানতে নরেনের হয়তো অনেকদিন দেরি হয়ে যেত।

সন্ধ্যা সেদিন একলা বাপের বাড়ি আসে। ছেলেমেয়ে দুটিকে বহন করে।

অশোকের সঙ্গে এই সেদিন যে সন্ধ্যা একা এসেছিল যুদ্ধ করে বাপ-ভায়ের কাছে টাকা আদায় করার জন্য—তার গ্র্যাজুয়েট স্বামী আরও পাস করে মাস্টার অব আর্টস হবার যুদ্ধে নামবে বলে বাপ-ভাই যে টাকা খরচ করতে রাজি হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুত খরচের বাকি অংশ আদায়ের জন্য—এ সন্ধ্যা যেন সে সন্ধ্যা নয়।

সন্ধ্যা ঝগড়া করতে আসেনি। সন্ধ্যা মান-অপমানভরা স্বামিত্ব-গর্বিণী মেয়ে হিসাবে আসেনি।

সন্ধ্যা আসেনি অশোক বা অশোকের পরিবারের কোনো বিপদকে আপন করে নিয়ে অশোকের পক্ষ নিয়ে বাপ-ভায়ের সঙ্গে লড়াই করতে।

তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে অশোকের বাপ-মা। প্রতিবাদ না করে নীরবে চেয়ে থেকেছে অশোক।

চাকরে ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেওয়াটা হাসিল করতে বেচারা আপিসের মাত্র সাতশো টাকা সরিয়েছিল—বাড়িতে কঠোর দারিদ্র পালন করে তিনমাসের মধ্যে বেআইনিভাবে নেওয়া টাকাটা শোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে।

সে তো জানে তার আপিসেই লক্ষ টাকার কীরকম এদিক গমন ওদিক গমনের হিসাবটা টাকা পয়সার হিসাবে উহ্য থাকে।

দুমাস কী বড়ো জোর তিনমাস। তিনমাসের মধ্যে নিশ্চয় সে পারবে টাকাটা যথাস্থানে পূরণ করে দিতে।

মোটা তহবিল নয়। আসল তহবিল থাকে ক্যাশিয়ার ফণীবাবুর হেপাজতে। তার দশ হাজার টাকা জামানত দেওয়া থাকলেও আরও দুজন মোটা জামানত দেনেওলা কর্মচারীর সই ছাড়া মোটা টাকা নাড়াচাড়া করার অধিকার ফণীবাবুর নেই।

বিলাতি বড়ো সায়েব নিজে সপ্তাহে যখন তখন দু-তিনবার এসে তহবিল পরীক্ষা করে যায়।

হাজার তিনেক নগদ টাকা অশোকের হেফাজতে সব সময় রাখতে হয়। এত বড়ো আপিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়ার জন্যই বাধ্য হয়ে রাখতে হয়।

তারও পাঁচশ টাকা জামানত আছে। হাফ পার্সেন্ট সুদে জামানত টাকাটা গোকুলে বাড়ছে তিলে তিলে। সে জানত যত কম টাকা দিয়ে তার কাজটা চালানো যায় কেবল তত টাকাই তার হেফাজতে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে তাকে ফণীবাবুর কাছ থেকে টাকা বার করে এনে আপিসের কাজ চালাতে হয়।

তার তহবিল কেউ কোনোদিন পরীক্ষা করতে আসে না। তার কোনো প্রয়োজনও নেই। কোম্পানির পক্ষে কাকে সে খুচখাচ কত টাকা দিয়েছে তার হিসাব থাকে অন্যত্র।

তার কাজটাই হল বড়ো সায়েবের আর তিনজন বড়ো কর্মচাবীর সই করা বা ইনিসিয়াল করা সাদা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে পাঁচ-দশ-বিশটাকা নগদ দিয়ে দেওয়া।

পুরো সই করা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে। ইনিসিয়াল করা কাগজের টুকরো যে আনবে তাকে আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে !

বছরের পর বছর চলে আসছে এ নিয়ম—কে জানত তিন মাসে ঠিক করে দেওয়ায় প্ল্যান করে মোটে সাতশো টাকা কাজে লাগাতে যাওয়ামাত্র প্রয়োগ হবে দুর্নীতি দমন নীতির তাণ্ডব ? লাখ লাখ টাকা যারা এদিক ওদিক করে এসেছে তারাই তাকে ধরবে ?

বড়োই বিপদে পড়েছে অশোক।

এ তো গেল দুঃসংবাদ।

এবার আসল সংবাদটা কী ? এভাবে সন্ধ্যার একলা আসার কারণ কী ? কারণ সকলেই বুঝেছে, কিন্তু সন্ধ্যার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত সে প্রসঙ্গ তোলা যায় না।

সন্ধ্যা বোধ হয় আশা করেছিল মা-বাবা একজন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ রকম একলা যে এলি ?

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে বুঝতে পারে প্রশ্ন তাকে কেউ করবে না, আপনা থেকেই তাকে কথা তুলতে হবে।

ক্ষোভে সন্ধ্যার চোখে বোধ হয় জল আসে। জিজ্ঞাসা করা হলে হঠাৎ এভাবে আসার কারণ কীভাবে বলবে মনে মনে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছিল, এখন সব গুলিয়ে যায়।

সোজাসুজি সে দাবি জানিয়ে বলে, এবার আমাদের ওই পাওনা টাকাটা দিতে হবে বাবা।

টাকার কথা কী ?

বলরামবাবু ক্যাশিয়ারবাবু ব্যাপারটা চাপা দিয়ে বেখেছেন—বদখেয়ালের জন্য নয়, বোনের বিয়ের দায় সামলাতে নিয়েছে, আস্তে আস্তে টাকা ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই নিয়েছে। তিন দিনের মধ্যে টাকাটা জমা দিলে ওঁরা কিছু করবেন না বলেছেন, চাকরিও যাবে না। শুধু এ কাজ থেকে অন্য কাজে সরিয়ে দেবেন। তোমাব কাছে ওর পাওনা টাকা পেলে বাকিটা জোগাড় করে নেব।

পাওনা টাকা ! পড়ায় ফাঁকি দিয়েও পড়ার খরচের টাকাটা পাওনাই রয়ে গেল অশোকের।

সন্ধ্যার গায়ে একখানাও গয়না নেই। তার খালি গায়ের কথাটা এতক্ষণ কেউ উল্লেখ করেনি, এবার তারিণী বলে, তোর গয়না দিয়ে বাকিটা জোগাড় হবে তো ?

দু-একখানা করে লাগবে—আমার আর শাশুড়ির। কিছু টাকা ধার করার চেষ্টা হচ্ছে, ধার পাওয়া গেলে আর গয়না লাগবে না। তোমার টাকাটা পেলেই হাঙ্গামা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

তারিণী নিশ্বাস ফেলে।

সে নিশ্বাসের অর্থ এই যে এ জীবনে আমারও হাঙ্গামা মিটেছে, তোমাদের হাঙ্গামাও মিটেছে। বেঁচে থাকাটাই নিছক হাঙ্গামার ব্যাপার।

আরেকটা নিশ্বাস ফেলে তারিণী বলে, কী আর বলব বল তোদেব ? জানিস আমার টাকা নেই, তবু আমাকে এসেই চেপে ধরবি টাকার জন্য।

সন্ধ্যা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বলে, বলে দিয়েছে, টাকাটা না নিয়ে যেন ফিবে না যাই।

খালি হাতে ফিরে গেলে তার কপালে কী জুটবে সে আর মুখ ফুটে বলে না।

উষা তীব্রকণ্ঠে মন্তব্য করে, অশোকদা এমন ছোটোলোক ?

বরেন আরও বেশি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, খালি অশোক কেন ? ওদের বাড়ির সবাই ছোটোলোক। ওটা ছোটোলোকের বাড়ি।

উষা বলে, তুমি আমাব বিয়ে দিয়ো না বাবা—দোহাই তোমার। চিবকাল আইবুড়ো থাকব—দরকার হলে ঝি-গিরি করে খাব।

বাপের বাড়িতে সন্ধ্যা এসেছে একলাই, তবে গলির মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সঙ্গে এসেছিল একটি ছেলে।

পাঁচুকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল যে সন্ধ্যার বাপের বাড়িতে ঢোকা তো দূরের কথা সে গলির মধ্যে পর্যন্ত ঢুকবে না। গলির মোড় পর্যন্ত সন্ধ্যাকে পৌঁছে দিয়ে সটান বাড়ি ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা ছেলেমানুষ পাঁচুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই হুকুম রদবদল করাবার কোনো চেষ্টা করেনি। মুখে একবার অনুরোধ জানালে ফিরে গিয়ে পাঁচু হয়তো নালিশ করবে যে তার বাপের বাড়িতে নেওয়ার জন্য সন্ধ্যা তার হাত ধরে টানাটানি করেছিল !

তাকে শুধু গলির মোড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল—বাপেব সঙ্গে ভায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর যদি কোনো খবর দেবার থাকে, যদি কোনো চিঠি দেবার থাকে।

তারিণীর কাছে কোনো আশা-ভরসা না পেয়েও সন্ধ্যা টাকাটা পাওয়া যেতেও পারে এই রকম একটু ভরসা দিয়ে দুলাইন একটা চিঠি লিখে নিজেই গলির মোড়ে পাঁচুর হাতে দিয়ে আসে।

বলে, তুমি পরশু সকালে একবার এসো।

আমি পারব না আসতে।

সন্ধ্যা তাকে আর কিছু বলে না। বলার দরকারও ছিল না। খামে-আঁটা চিঠিতে সে পাঁচুকে পাঠাবার কথা লিখে দিয়েছে, তার মুখের উপর যাই বলুক পাঁচু, পরশু সকালে লেজ নিচু করে তাকে আসতেই হবে।

সন্ধ্যা এসেছিল সকালে। মাধবের বইয়ের প্রুফ প্রেসে পৌঁছে দিয়ে পাওনা টাকা থেকে দুটি টাকা উশুল করিয়ে একতাড়া নতুন প্রুফ নিয়ে বিকালের দিকে নরেন আসে।

আজ আর প্রুফ দেখবে না। শুধু মন নয়, চোখও অস্বীকার করছে প্রুফ দেখতে। সব চেয়ে ছোটো ইংরাজি হরফে ঠাসবুনানি লাইনে ছাপা হয়ে বইটা বেরোবে—সাধে কী প্রুফ দেখতে দেখতে চোখ কটকট করে, বেশি খিদে পেলে চোখের সামনে অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায় !

সব শুনে নরেন বলে, ওই বলরামবাবু না কে, অশোককে উনি একটু পেয়ার করেন, না ?

উনিই চাকরি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পড়ে আর কী হবে ?—চাকরিটা খালি হয়েছে, ঢুকে পড়ো।

তাই ভাবছিলাম। ছুতো না পেয়েই আমাদের তাড়ায়—চাকরি খসিয়ে একেবারে জেলে দেবার এমন সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে !

সন্ধ্যা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ও সব কথা শুনে কী হবে দাদা ? তোমরা সবাই মিলে আমার একটা বিহিত করো ?

বিহিত তো অশোকেরা করেই দিয়েছে। গয়না কেড়ে রেখে জন্মের মতো বিদেয় করে দিয়েছে।

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে। গা তার জ্বলে যায় নরেনের কাটা কাটা কথায়, কিন্তু চুপচাপ সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও তো তার নেই। সে আজ একূল ওকূল দুকূল হারাতে বসেছে।

নরেন বলে, ম্যাট্রিক পাস করেছিস কিন্তু তোর এতটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা হয়নি সন্ধ্যা, একফোঁটা সাংসারিক জ্ঞান জন্মায়নি। ওরা বলতেই তুই ছুটে এসে আমাদের বলছিস বিহিত করতে ! একলা সংসারটার বিহিত করে উঠতে না পেরে বাবার কী দশা হয়েছে দেখতে পাস না ? আমি কাল সারাদিন চার পয়সার মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। ভাগ্যে বিকালে নন্দন গিয়ে হাজির হয়েছিল, আরও চারটি মুড়ি জুটল। চোখ টাটিয়ে প্রুফ দেখে দুটো টাকা নিয়ে এসেছি—দুটো দিন চলে যাবে।

নরেন একটু থামে।

সে বুঝতে পারে কড়া ধমকের সুরে তাকে এ সব কথা বলতে শুনে সন্ধ্যার মনে আশা জেগেছে। সন্ধ্যা ভাবছে, টাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে হবে বলেই তার রাগ হয়েছে—এভাবে ধমক দিয়ে সে কথা বলছে।

নিজের বোকামি আর ভাবালুতার জন্য নরেন লজ্জা বোধ করে। সত্যই তো, বিপদে পড়ে যে এসেছে সাহায্যের জন্য তাকে ফাঁকা ভর্ৎসনা আর উপদেশ দেওয়ার কোনো মানে হয় ?

নরেন শান্ত ও সংযত সুরে বলে, এটা বললাম আমার অক্ষমতার কথা। কিন্তু আমার যদি অনেক টাকা থাকত, টাকা দিয়ে তোর ফিরে যাবার বিহিত করার সাধ্য থাকত, তবু আমি এ বিহিত করতাম না।

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট সুরে বলে, তোমার যদি অনেক টাকা থাকত, ওরাও কী এভাবে বিহিত করার জন্য আমায় পাঠাত, না পাঠালে আমিই তা সইতাম ? নিজে এসে তোমার পায়ে ধরত।

কড়া ঝাঁঝালো সুরে বোনকে ধমকাতে শুরু করেছিল, এবার নরেন প্রায় কাতরকণ্ঠে কথা বলে।

এর পরেও তুই ফিরে যাবি ?

না গেলে তোমরা আমায় খাওয়াবে ? আমার ছেলে দুটোকে মানুষ করবে ?

আমরা কেন খাওয়াব ? নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করে নিবি। মামলা করে গয়না আদায় করবি, খোরপোষ আদায় করবি।

সন্ধ্যা অবজ্ঞার সুরে বলে, তাই বল। এ রকম ছেলেমানুষি বুদ্ধি না হলে তোমার আজ এ দশা হয় ! একটা আইন থাকলেই বুঝি তা খাটানো যায় ? এত আইন থাকতে এত বেআইনি কাজ তবে সংসারে ঘটছে কী করে ?

সন্ধ্যার কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়—কিন্তু নরেনও তো সত্যসত্যই তাকে আইনের সাহায্য নেবার কথা বলছিল না। সে আসলে তাকে বলছিল একটু শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কথা, চোখ কান বুজে সব সয়ে না গিয়ে একটু তেজ দেখাবার কথা।

সে বলে, আমাব কথাটা তুই মোটেই বুঝলি না। আমি বলছি—পেটের ভয়ে অন্যায়কে কখনও মাথা পেতে মানতে নেই। শেষ পর্যন্ত তাতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়। ঝি-গিরি করেও যখন টিকে থাকা যায়—এত অপমান সইবি কেন ?

এবার সন্ধ্যা রেগে যায়।—অন্যায়টা কীসের ? আমার অপমান হল কাদের জন্য ? ওর পাওনা টাকা তোমরা ওকে দেবে না—আদায় করতে চাইলে হবে অন্যায়। অন্যায তো তোমাদেব ! তোমরা অন্যায় করেছ ব'লেই তো ওরা আমায় এভাবে ঝাঁটা মেরে পাঠাতে পেরেছে ? স্বামীর জেলে যাওয়া ঠেকাবার জন্য চেষ্টা আমি করব না ? এতে আমার কোনো অপমান নেই—অপমান তোমাদের।

তবে আর বলার কী আছে !

বোনের কাছে কথায় হার মানার এত লজ্জা এত ঝাল ? ঝালটা একটু সয়ে এলে নরেন বুঝতে পারে, জ্বালাটা তার সন্ধ্যার কাছে কথায় হার মানার জন্য নয়— নিজের প্রাণের কাটা ঘায়ে নিজেই নুন ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য তার জ্বালা। এবারও সন্ধ্যা ওদের পক্ষ নিয়ে তাদেব সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে, এই বাস্তবতা তার অসহ্য ঠেকছে। বাস্তবতার কাছে এত ছেঁচা খেয়েও সে রযে গেছে এমনই অন্ধ নীতিবাগীশ !

কে জানে, সবটা না হলেও অনেকটাই হয়তো সাজানো ব্যাপার, বানানো কথা। আপিসের টাকা নিয়ে অশোকের বিপদে পড়ার কথাটা সত্য—কিন্তু গয়না কেড়ে নিয়ে বাপের কাছে টাকা আদায় না করে ফিরে যেতে বারণ করে সন্ধ্যাকে পাঠানোর কথাটা মিথ্যাও হতে পারে। অশোকের সঙ্গে পরামর্শ করেই হযতো সন্ধ্যা এভাবে এসেছে—চাপ দিয়ে যাতে টাকাটা আদায় করা যায়।

নরেনকে দিয়ে সন্ধ্যাই নন্দনকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনে।

দোকানেব কাজ সেরে নন্দন আসে রাত দশটায়।

বলে, খুব জরুরি ব্যাপার বলে এলাম, নইলে আসতাম না।

আসতে না মানে ?

আসা উচিত হত না।

বুঝিয়ে বলো। এসেই দেখি ঝগড়া শুরু করলে !

নন্দন শান্ত গম্ভীর গলায় বলে, সোজা স্পষ্টভাষায় বলি, মনে লাগলে দোষ ধরো না। এ সব কথা স্পষ্ট বলাই ভালো। এ অবস্থায় এসেছ—তোমায় এক রকম তাড়িয়ে দিয়েছে। এসেই তুমি আমায় ডেকে পাঠালে—আমাকেও বাধ্য হয়ে রাত সাড়ে-দশটার সময় আসতে হল। আমাদের ভাব ছিল, এ তো সবাই জানে। আমি একটা চাকরি পেলে অশোকের বদলে আমার ঘরেই তুমি আসতে। চাকরি না পেলেও আসতে,—যদি একটা চাকরে বাপ থাকত। এম এ পাস করেছি অশোকের বি এ ডিঙোনোর আগেই ? অশোকও এ সব কথা অল্পবিস্তর নিশ্চয় শুনেছে। এ রকম অপমান হয়ে এসে তুমি এভাবে আমায় ডেকে পাঠালে।

সন্ধ্যা ধৈর্য হারিয়ে বলে, বাবা রে বাবা, তোমাদের সকলের কি মাথা খারাপ হয়েছে ? দাদা বললে ওরা অন্যায় করেছে, তোকে অপমান করেছে,—তুমিও সেই গাউনি গাইতে শুরু করলে ! অন্যায় কার আমি জানি নে ? আমার অপমান আমি বুঝি নে ? ওদিকে ওরা কোনো অন্যায় করেনি, আমায় কেউ অপমান করেনি।

তাই নাকি !

কী তবে ? অপমান হয়ে এসেছি, গায়ের জ্বালায় তোমায় পিবিত কবতে ডেকে পাঠিয়েছি—এ সব কোন দেশি কথা ? একদিন ভাব ছিল তো আজকে কী ? আজ অন্যরকম ভাব।

নন্দন বলে, ও ! অন্যরকম ভাব।

সন্ধ্যা জোর দিয়ে বলে, তা নয় ? ভাব কী শুধু ওই এক রকমের হয় ? স্নেহ মমতার সম্পর্ক নেই ? বন্ধুত্ব নেই ?

নন্দন চমৎকৃত হয়ে শোনে।

এক ধমকে তাকে চুপ করে যেতে দেখে সন্ধ্যা প্রাথমিক জয়ের গর্বে একটু হাসে। জয়যাত্রা এগিয়ে নেবার জন্য বলে, আমি তো জানি তুমি আমার ভালো ছাড়া কখনও মন্দ চাইবে না। বিয়ে হয়নি বলে ভালোবাসা তো মরে যায় না। দরদ সবাই করে—কারও কম কারও বেশি। জানি তো তোমার দরদটাই সব চেয়ে খাঁটি ? তাই ভাবলাম, বিপদে পড়েছি, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক। তোমার কাছেই খাঁটি পরামর্শ পাব।

শুনতে শুনতে নন্দনের মনে হয় আজ বুঝি সে প্রথম হদিস পেল রূপকথা আর কাব্যকথার আসল মানের, আসল তাৎপর্যের। আজ বুঝি সে প্রথম টেব পেল যে মহান রূপকথা আর মহৎ জীবনকাব্যকে কীভাবে পচিয়ে গলিয়ে ছেলেভুলানো মদ বানিয়ে ছেলেবেলা থেকে তাকে নেশায় বুঁদ করে রাখাব চেষ্টা করে আসা হয়েছে !

এত বয়সেও, এম এ পাস করে এতকাল বেকারি করে আসার পরেও—বাস্তবতার কঠিন চিকিৎসায় নেশা কেটে যাওয়ার উপক্রম করলেও—ওই মদের পিপাসা কেটে যায়নি, ওই নেশাকে দাম দিতে কুণ্ঠা হয়নি।

সব চেয়ে মজা এই, যাকে কেন্দ্র করে ওই নেশা চরমে তোলা সেই আজ তার নেশা কাটিয়ে দিব্যজ্ঞান এনে দিয়েছে।

নন্দনকে বড়োই লড়তে হয়েছে সারাদিন—বড়োই খাটতে হয়েছে। কত অপমান যে মাথা পেতে মানতে হয়েছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একঘেয়ে ক্লান্তিকর খাটুনির সঙ্গে। এতদিন বেকার ছিল, নন্দন বুঝতে পারেনি তাদের মতো তুচ্ছ মানুষের দায়ে পড়ে বেতন নিয়ে পরের কাজ কবা কী বিড়ম্বনা।

নরেন একদিন তার চাকরি পাওয়া ভাগ্যের নিন্দা করেছিল—বন্ধুকে দীর্ঘকাল বর্জন করার অজুহাত দাঁড় করিয়েছিল চাকরি পাওয়া।

শুনে তখন রাগ হয়েছিল নন্দনের। কাজ পেয়ে আজ সে বুঝতে পেবেছে নরেনের অভিযোগের মানে।

সারাদিন খেটে খেটে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ আর অপমানে অপমানে তিতো বিরক্ত মন নন্দনের বিগড়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কী ?

এ অবস্থায় নিষ্ঠুর কঠোর এক অন্যায় প্রতিশোধের ঝোঁক চাপলে তাকে দোষ দেওয়া যায় কোন নীতিতে ?

সে তো মানুষ ?

রক্তমাংসের মানুষ ?

মানুষের মতো বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ ?

স্থিরদৃষ্টিতে সন্ধ্যার চোখে চোখে তাকিয়ে ধীর গলায় নন্দন বলে, তুমি আমায় মুশকিলে ফেলে দিলে সন্ধ্যা।

তার ভাবান্তর দেখে সন্ধ্যার জয়ের গর্ব খানিকটা উপে যায়, একটু ভড়কে গিয়ে সে বলে, মুশকিলে ফেলে দিলাম ?

তোমায় আজও আমি ভালোবাসি। এ জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। তোমার জন্য রাত্রে আমার ঘুম হয় না।

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে।

নন্দন বুঝতে পারে সন্ধ্যা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ভালো লাগত বলেই স্কুলের মেয়ে সন্ধ্যা কলেজের ছেলে তার সঙ্গে খেলা করত বটে কিন্তু সাড়া কি আর একেবারেই জাগত না তার হৃদয়ে ? আজ শুকনো নীরস হয়ে গেছে সে হৃদয়—ভয়ে তাই সে চুপ করে আছে যে কথা বলতে গেলে পাছে নন্দন সেটা টের পেয়ে যায় !

নন্দন গলা থেকে আবেগ বিসর্জন দিয়ে বলে, জানো তো তোমার জন্যেই এত কষ্ট এত নির্যাতন সহ্য করে এম এ পাস করেছিলাম ? তোমার জন্যে না হলে কবে এদিকে ওদিকে কোনো একটা ছুটকো কাজ নিয়ে কেটে পড়তাম। যা পেতাম তাতেই বেশ বগল বাজিয়ে স্ফূর্তি করে দিন কাটাতাম।

সন্ধ্যা ভয়ে ভয়ে বলে, পাস করেও তো দেড় বছর কোনো চাকরি জোগাড় কবতে পারলে না। নইলে—

নন্দন বলে, তোমার জন্য মরি-বাঁচি পণ করে এম এ পাস করলাম—পাস করাব জন্যেই সহজে চাকরি পেলাম না। আজেবাজে চাকরি তো করতে পারি না এম এ পাস করে ? ম্যাট্রিক পাসের সঙ্গে তো কমপিট করতে পারি না ? তাই ধৈর্য ধরে থাকতে হল।

সন্ধ্যা চুপ করে শোনে।

ধৈর্য না ধরতে পারলে কি এ রকম চাকরিটা বাগাতে পারতাম ? চাবটে কারবার রাধাবমণেব, বছরে আট-দশলাখ টাকা আয়—একটা চিঠি লিখতে পর্যন্ত আমাব পরামর্শ চায়।

ছাইয়ের মতো বিবর্ণ দেখায় সন্ধ্যার মুখ।

নন্দন মমতা বোধ করে। বড়োই মমতা বোধ করে—স্কুলের বয়স থেকে যার জন্য মমতা বোধ করতে কবতে প্রেম জন্মে গিযেছিল—অল্পবুদ্ধিতে ভালো না বেসেও ভালোবাসার ভান করে সে তাকে খেলিয়েছে বলেই কী তার জন্য মমতা বোধ না করে পারা যায় ?

সে তো রক্তমাংসের মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মায়া-মমতার জগতে তো তার বাস।

কিন্তু এমনই প্রচণ্ড ঝোঁক তার এসেছে অন্যায় প্রতিশোধ নেবার যে ওই মমতার বাধা ঠেলে সে বলে, তাই বলছিলাম, মুশকিলে ফেলে দিলে। মুশকিলটা কী জানো ? পাঁচশো টাকা চাপ দিয়ে যখন ইচ্ছা আনতে পারি, ভীষণ বিপদের কথা বানিয়ে বলছি বুঝলেও ওরা টাকাটা দেবে—আসল বিপদ গোপন করে একটা বিপদেব অজুহাত দিয়ে চাইছি জেনেই দেবে। অবশ্য সুদে-আসলে ঢের বেশি আদায় করে নেবার জন্যেই দেবে—কিন্তু দেবে।

সন্ধ্যা পাংশু মুখে চেয়ে থাকে।

আমি কারও জন্য এভাবে টাকা নিতাম না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তোমার জন্য ব্যবস্থাটা করতেই হবে। সেই জন্য বলছিলাম আমাকে তুমি বড়ো মুশকিলে ফেললে।

নরেন আগেই টের পেয়েছিল, তার সঙ্গে সন্ধ্যার কথাবার্তা বলার পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্যই এ ঘরটাকে যেন আড়ালে ঠেলে দেওয়া হযেছে এতগুলি মানুষের দুটি ঘরের সংসার থেকে !

বড়ো কঠিন সমস্যার ভার নিয়ে জীবনসমুদ্রে ডুবতে বসে সন্ধ্যা তাদের ঘাড়ে চেপে তাদেরও ডুবোতে এসেছে।

বড়ো মহাজনের কাছে চাকবি করছে নন্দন। একদিন সন্ধ্যাব সঙ্গে ভাব ছিল নন্দনের, ভালোবাসা ছিল।

নন্দনকে অবলম্বন করে ফাঁড়া কাটাবার উপায কবে তাদেব যদি বেহাই দিতে চায় সন্ধ্যা—তাদের দুজনকে নিরিবিলি আলাপ-আলোচনাব সুযোগ করে দিতে হবে বইকী।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে সন্ধ্যা জোর দিয়ে একটু কড়াসুবেই বলে, তোমায় মুশকিলে ফেললাম ? তবে থাক !

থাকবে কেন ? আমাকে মুশকিলে ফেলার অধিকার তোমার না থাকলে কার আছে।

সন্ধ্যা নরম সুবে বলে, রাত হযেছে, সারাদিন খেটেছ-খুটেছ, এবাব বরং তুমি বাড়িই যাও।

তখনও হযতো নিজেই প্রতিশোধের ঝোঁকটা সামলে ফিবে যেতে পারত নন্দন, ফিরে গিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা কবত সন্ধ্যাব বিপদ ঠেকাতে—কিন্তু সন্ধ্যার কথা বলার ভঙ্গিটা তার ঝোঁকটাকেই আরও চড়িয়ে দেয়।

ভাবছ কেন ? কাল আমি সব ঠিক কবে দেব। কাল যদি না তোমায় আমি নোটের তাড়া—

কথা শেষ না করেই নন্দন দরজা বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে ছবিরাণীতে ঠোক্কর খায় !

এত রাত্রে ঘুমন্ত পুরীতে—কে জানে ঘুমন্ত কিনা ?—ছবিরাণীতে ঠোক্কর খেয়ে নন্দন পরম স্বস্তি বোধ করে।

তার সমগ্র সত্তা তখন উত্তর চাইছিল : এ কী প্রতিশোধ ? অথবা অশোক যেমনভাবে ঠকিয়ে আসছে বেচারা সন্ধ্যাকে—সে-ও তেমনইভাবে ওকে হাতের মুঠোয় পেযে তেমনইভাবে ঠকাতে চায় ?

তুই এখানে কী করছিস ?

বাড়িব মানুষ কেউ কোথাও নেই, ছবিরাণী বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে—একা।

ছবি বলে, এত রাত্রে তুমি এ বাড়ি এলে—কী হয়েছে না হয়েছে কিছু বলে এলে না। আমি ভাবলাম ভযানক কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। তাই তোমার পিছু পিছু চলে এলাম।

সন্ধ্যা নিশ্চয দেখেছিল ছবিরাণীকে। তাই নোটের তাড়া নিয়ে পবদিন আসবার কথা বলতে বলতে চৌকি থেকে উঠে তাকে দরজা বন্ধ করতে আসতে দেখেও কথাটি বলেনি। দেহমন কুঁকড়ে যেতে চায় লজ্জা ঘৃণা আর আত্মধিক্কাবে। এতদিনের লড়াই.কবে বজায রাখা পৌরুষ যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

রক্ষণাবেক্ষণ সন্তানপালন ভরণপোষণ সব বিষযে পুরুষানুক্রমে মেয়েদের মুখাবলম্বিনী করে রেখে এসে পুরুষ জাতের আত্মকলহে হাব মানার ঝাল পুরুষ হয়ে আজ সে ঝাড়তে যাচ্ছিল উপায়হীনা উন্মাদিনী সন্ধ্যার উপর !

তার নিজের ছেলেমানুষি স্বপ্ন তারই ইচ্ছায় তারই চেষ্টায় গড়তে দিয়েছিল বলে—গড়তে দিয়ে কাপুরুষ তার জীবনবিরোধী আত্মনাশকে, দুর্দিনের স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বীকার করেনি বলে—পুরুষের গুণ্ডামির অধিকার খাটিয়ে সে প্রতিশোধ নিতে চাইছিল সন্ধ্যার উপর।

অপেক্ষমানা বোনের ঘাড়ে হোঁচট না খেলে সন্ধ্যাকে ভেঙে চুরমার করে কে জানে কীভাবে নন্দন জের টানত সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার।

খাঁটি আত্মধিক্কারে খাঁটি দায়িত্ববোধে তার যেন আত্মকেন্দ্রিকতাব লজ্জা ভয় গ্লানি বোধ দূর হয়ে যায়।

গলা চড়িয়ে সে ডাকে, কাকিমা ? উষা ? নরেন ?

ছবিরাণী চাপা গলায় বলে, কী পাগলামি করছ ? চলো না আমরা বাড়ি ফিরে যাই ?

দাঁড়া। এদের সঙ্গে কথা বলে নিই ?

কার সঙ্গে কথা বলবে ? ওরা কেউ বাড়ি আছে নাকি ? শুধু তারিণী কাকা—কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বুড়ো মানুষকে ডেকো না।

সবাই গেছে কোথায় ?

সেই মামার বাড়ি—নরেনদাকে যে চাকরি দিয়েছিল। তার ছোটো মেয়ের বিয়ে। তারিণী কাকার শরীর ভালো নয় বলে যাননি।

সন্ধ্যার কথা সে উল্লেখও করে না। সন্ধ্যা কেন মামাতো বোনের বিয়েতে সকলের সঙ্গে যায়নি বলা সে বোধ হয় প্রয়োজন মনে করে না।

নন্দন ভাবে, তাদের নিরিবিলি কথা বলাব সুযোগ তবে কেউ করে দেয়নি—স্বাভাবিক কারণেই বাড়িটা শূন্য হয়ে আছে।

তারিণী কাকাকেই বলে যাই কথাটা।

তার প্রথম হাঁকেই তারিণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরে আলো জ্বেলে চোখে চশমা আঁটতে আঁটতে সে বাইরে আসে।

নন্দন বলে, আপনি আবার উঠলেন কেন ? আমি ঘরে গিয়ে কথাটা জানাতে পারতাম।

তারিণীর গলা কেঁপে যায়।—কী কথা বাবা ?

নন্দন সোজা স্পষ্টভাষায় তারিণীকে বলে, এ রকম বিপদে পড়ে এসেছে—সন্ধ্যাকে কালকের মধ্যে পাঁচশো টাকা জোগাড় করে দিতেই হবে। নরেনের সঙ্গে কথা বলেছি, নরেনও সায় দিয়েছে। পাঁচশো টাকার জন্য—

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে দেখে নন্দন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

নন্দন দ্বিধাহীন জোর গলায় ঘোষণা করে, নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করেছি কালকেই টাকার ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পারব। কালকেই সন্ধ্যা অশোকের সমস্ত পাওনা টাকা নিয়ে ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা কেবল একটি প্রশ্ন করে, দাদার সঙ্গে আগেই তোমার টাকার কথা হয়েছিল ? দাদাকে বলেছিলে কীভাবে টাকা জোগাড় করবে ?

বলেছিলাম।

এই সান্ত্বনাটাই অবশিষ্ট আছে নন্দনের। এখানে এসে সন্ধ্যার উপর প্রতিশোধ নেবার ঝোঁক চাপার অনেক আগেই সে ঠিক করে ফেলেছিল রাধারমণের কাছ থেকে টাকা ধার করে সন্ধ্যাকে বাঁচাবে।

এত রাত্রে ছবিরাণীকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে এত কাণ্ডের পর।

কে জানে ছবিরাণী কী ন্যাকামি জুড়বে, কীভাবে তাকে জানিয়ে দেবে যে আজ থেকে ছোড়দার জন্য, তার এম এ পাস করা শিক্ষিত ছোড়দার জন্য যেটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালোবাসা তার ছিল সব শেষ হয়ে গিয়ে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার স্থান দখল করেছে।

হয়তো সারাপথ একটি কথা না বলে সে তার এই মনোভাবটা জানিয়ে দেবে।

পথে নেমে চলতে আরম্ভ করে ছবিরাণীর প্রথম কথাতেই সে তাই চমৎকৃত হয়ে যায়।

ছবিরাণী পথে নেমেই বলে, সন্ধ্যার বিপদে তুমি পাঁচশো টাকা জোগাড় করার ভার নিতে পার। আমার সর্বনাশটা দু-একমাস ঠেকাবার জন্যে কিছু করতে পার না। মায়ের পেটের বোন তো নই, করবে কেন !

চমৎকৃত নন্দন বলে, তুই নিজেই তো বলেছিস শুনলাম ভালোবাসায় পেট ভরে না। বেকারের চেয়ে তোর চাকরে বর ভালো।

মুখে একটা কথা বললেই বুঝি সেটা প্রাণের কথা হয় ? ভুল বুঝে কেউ বুঝি কোনোদিন ভুল কথা বলে না ? সেটাই শেষ কথা ধরে নিতে হবে !

ভুলটা স্বীকার করে কথা বলে এলেই চুকে যায়।

ছেলেবেলা থেকে ছেঁচা খেয়ে খেয়ে মানুষ হয়েছ, তুমি বুঝবে না। মেয়েরা ভুল স্বীকার করতে গেলেই অন্য মানে দাঁড়িয়ে যায়।

তোদের মন বড়ো বাঁকা।

একেবারে নির্জন নয় পথ। শহরের কোনো পথ বোধ হয় কখনও একেবারে নির্জন হয় না। দু চারজন লোক, কয়েকটা পশু পথকে একেবারে নির্জন হতে দেয় না।

ছবিরাণী দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে, তোমরা পুরুষরাই আমাদের এ দশা করেছ। মুখ খুলে কিছু বলা, নিজে থেকে কিছু করা, আমাদের বারণ। ভুল করেছি বলতে গেলে তোমার বন্ধু কী ভাববে জানো ? চাকরে ছেলেটা ফসকে গেছে, হাতের পাঁচ হিসেবে ওকে হাতে রাখতে চাইছি।

নন্দন হাই তুলে বলে, চাকরে ছেলেটাকে ফসকে দেবার কথাই তো আমাকে বলছিস তুই ?

বলছিই তো। সর্বনাশটা ফসকিয়ে দাও। তাই বলে ভুল স্বীকার করতে যাব নাকি আমি ? তা কখনও যাব না। তুমিও কিছু বলতে যাবে না। ভাববে তোমায় দিয়ে আমিই বলাচ্ছি। চাকরি পেয়েছ, বাকি জীবনটা নয় তোমার সংসারেই দাসী হয়ে থাকব। তোমার বন্ধু আসতেও তো পারে একবার ? এলে তখন ভুল স্বীকার করব—জানবে যে আমি সস্তা নই।

আমার ঘুম পেয়েছে ছবি। খিদেও পেয়েছে। চল বাড়ি যাই।

রাস্তার আলোতেই বোঝা যায় অপমানে কালো হয়ে গেছে ছবিরাণীর মুখ। চলতে আরম্ভ করে সে বলে, তুমি ছোটোলোক বনে গেছ ছোড়দা।

১১

একটা ইন্টারভিউ ছিল। কিছু হবে না জেনেও নরেন ভাগ্য পরীক্ষা কবতে যায়।

সামান্য চাকরি, তারই জন্য প্রার্থীর কী ভিড় ! কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার পরেই জানিয়ে দেওয়া হল যে একজনকে বহাল করা হয়েছে, তাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

নরেন একজনের মন্তব্য শোনে, আজকের জন্য কী আর বাকি ছিল বাবা, বহাল আগেই হয়ে গেছে। ঘরের লোককে বহাল করবি এ তো জানা কথাই বাবা, মিছিমিছি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঁদর নাচিয়ে পয়সা খসিয়ে হয়রান করিস কেন ?

আরেকজনকে সে বলতে শোনে, জানি তো কিছু হবে না তবু কেন লোভ দেখাস ? ট্রাম-বাসের পয়সাটাও তো নষ্ট করালি ?

ট্রাম-বাসের পয়সা ! ট্রাম-বাসেব পয়সাও নরেনের পকেটে আজ নেই। হাঁটতে হাঁটতে বস্তির ঘরে ফিরতে হবে !

তার বস্তির ঘর অনেক দূর। যে প্রেসে মাধবের বই ছাপা হচ্ছে সেটা কাছেও বটে, একটু ঘুর হলেও তার বস্তিতে ফেরার পথেও বটে।

টিকিট না করার কায়দায় গোটা দুই তিন ট্রামে ওঠানামা করে প্রেসে পৌঁছানো যাবে, হাঁটতে হবে না।

নরেন ট্রামের ফার্স্টক্লাসে উঠে গম্ভীর মুখে গদি আঁটা আসনে বসে। পকেটে যার রেস্ত নেই একটি পয়সাও, টিকিট করবে না ঠিক কবেই যে গাড়িতে উঠেছে, তাব আবার ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড-ক্লাসের হিসাব কীসের '

দুপুরবেলা, গাড়িতে লোক কম। ভীড় থাকলে কন্ডাক্টরের টিকিট চাইতে দেরি হত, বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া চলত—এখন উঠে বসার একটু পরেই কন্ডাক্টর এসে টিকিট চায়।

পয়সা নেই ভাই।

কন্ডাক্টরের বয়স অল্প—বোঝা যায অল্পদিন কাজে ভর্তি হয়েছে। ওদিকের কন্ডাক্টরটি প্রৌঢ়বয়সি।

কয়েক মুহূর্ত নরেনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে নিচু গলায বলে, আমি জোর গলায নেমে যেতে বলব—নামবেন না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবেন।

বুঝেছি।

ওঠানামার প্ল্যাটফর্মে ফিরে গিয়ে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে কন্ডাক্টর বলে, পযসা নেই তো উঠেছেন কেন ? নেমে যান।

নরেন বলে, ভদ্রলোকের ছেলে, পকেটে পয়সা নেই বললাম, তবু একেবারে নামিয়ে দেবে ?

কী করব বলুন ? ডিউটি করতে হবে তো ?

শুধু বিলাতি কোম্পানির ডিউটি করবেন ? একজন মুশকিলে পড়েছে তার জন্য কোনো ডিউটি নেই ?

ওদিকের কন্ডাক্টর বলে, নেমে যান না মশায ?

কিন্তু নরেন তখন বুঝে গিয়েছে ওদের ডিউটি করার মানে—টিকিট যখন করনি, কড়াসুরে তোমায় নেমে যেতে ওদের বলতেই হবে। তাতে যদি অপমান বোধ হয় নেমে যাবে ! নইলে ওটুকু সয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাক।

কে বলতে পারে, হয়তো বেশ কয়েকটা পাস দিয়েও হতে হয়েছে ট্রামের কন্ডাক্টর—ভদ্রঘরের ছেলেদের অবস্থা ওর অজানা নয় !

বেশ বড়ো এবং আধুনিক প্রেস। ম্যানেজার হিরণ্ময় মাঝবয়সি হাসিখুশি মানুষ, কাজের লোক। তার চেষ্টাতেই প্রেসের অনেক উন্নতি হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করে, কী খবর নরেনবাবু ?

নরেন বলে, আমার কিছু পাওনা নেই, না ?

সে জানে জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য, পাওনা তার কিছুই নেই। হিরণ্ময় বলে, আপনি তো ফর্মা রেডি করে দিচ্ছেন, আর টাকা নিয়ে যাচ্ছেন।

একটা চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, নইলে একটা ফর্মা রেডি করে আনা যেত। আমায় দুটো টাকা আগাম দিন—পকেট একেবারে গড়ের মাঠ।

হিরণ্ময় কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি অন্য কোনো কাজ করেন না ?

কাজ পেলে তো করব ?

আপনার প্রুফ দেখা খুব ভালো হচ্ছে। তবে দেখেই বোঝা যায় প্রফেশনাল নন—ধরে ধরে আস্তে আস্তে দ্যাখেন।

দেখা প্রুফে বানান ভুল টুল পাবেন না, লেখাপড়াটা ভালো করেই শিখেছিলাম। কিন্তু অভ্যাস নেই, দেখতে বেশি সময় লাগে। তবে বেকার মানুষ, সময়ের কোনো অভাবও নেই।

হিরণ্ময় একটু ভেবে বলে, আপনি আরও দু-একখানা বইয়ের প্রুফ দ্যাখেন না কেন ? সামান্য হলেও আয় তো।

দিন না ব্যবস্থা করে ?

নরেন ভাবে, সত্যি, কী যান্ত্রিক হয়ে গেছে তার মন, এ কথাটা একবার খেয়ালও হয়নি ! প্রুফ দেখাও যে একটা কাজ, সে কাজ করলে যে দু-চারটে টাকা মেলে, আগে খেয়াল না হলেও মাধবের বইয়ের প্রুফ দেখে দিয়ে পয়সা পাবার পরেও মনে হল না যে আরও দু-চারখানা বইয়ের প্রুফ সে অনায়াসে দেখে দিতে পারে !

হিরণ্ময় বলে, তা দু-একখানা দিতে পারি। তবে এ বইয়ের চেয়ে রেট কিন্তু কম হবে—ওগুলি সাধারণ বই।

নরেন বলে, বেশ তো, রেট কম হোক। দু-একখানা কেন, দু-চারখানার ব্যবস্থা করে দিন না ? পরীক্ষার জন্য মাসের পর মাস দিনরাত পড়েছি—পয়সার জন্য নয় তেমনিভাবেই খাটব।

হিরণ্ময় একটু হেসে বলে, কী জানেন, এ বড়ো এলোমেলো কাজ। কখনও হয়তো একসঙ্গে তিন-চারখানা বই পাবেন, কখনও হয়তো একখানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মিনিমাম একখানা হাতে থাকবে ধরে নিতে পারি তো ?

তা ধরে নিতে পারেন। কিন্তু একটা বইয়ের প্রুফ দেখে কত আর পয়সা পাবেন ?

দিন চারেকের মধ্যে হিরণ্ময় তাকে একটি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক এবং একটি বাংলা উপন্যাসের প্রুফ দেখার কাজ জুটিয়ে দেয়।

পুরো একটা দিন ভাববার সময় নিয়ে নরেন বলে, আমি তো চললাম রে মণ্টু।

কোথা যাবেন ?

বাড়ি ফিরে যাব।

দীননাথ খুশি হয়ে বলে, এ ভালো বুদ্ধি করেছেন। আপনজনার পরে ক-দিন রাগ রাখা যায় ?

রাগের কথা নয় হে দীননাথ—বিচার-বিবেচনা।

নরেনের হিসাব খুব সোজা। এখানে থাকলে চাকরি-বাকরির খোঁজখবর পাওয়ার বড়ো অসুবিধা। বাড়ি ফিরে যাবার উপায় থাকতে এখানে দুটাকা ঘরভাড়াই বা কেন গুনবে ? ঊষার মুখ দিয়ে সকলে তাকে যে অনুরোধ জানিয়েছিল, এখন সেটা রাখা যায়। বাড়ির লোকের উপর সে অবশ্য এতটুকু ভার চাপাবে না—বাড়ির মানুষ খাবে আর তাকে উপোস করতে দেখবে, এ অসুবিধা মোটামুটি দূর হয়েছে। নিজে রেঁধে খাব—দু-একবেলা উপোস দেবার দরকার হলে বাড়ির লোককে জানালেই চুকে যাবে যে সে বাইরে খেয়ে এসেছে।

মা থাকতে বোন থাকতে, দুবেলা রান্নার ব্যবস্থা চালু থাকতে সে ভিন্ন রান্না করবে—এটা কটু লাগবে সকলের। কিন্তু নরেন জানে, কটু লাগবে শুধু গোড়ার কয়েকদিন, তারপর সয়ে যাবে। নিজে রেঁধে খাক, শাকভাত খাক, নিজের রোজগারে সে যে খাচ্ছে এতেই খুশি থাকবে বাড়ির লোক।

আশা করবে সুদিনের।

আপশোশও করবে। এত লেখাপড়া শিখে সংসারের জন্য কিছুই সে করতে পারে না—এ আপশোশ ঘুচবার নয়। তবে এ আপশোশের ঝাঁঝ আর তেমন আর লাগবে না, সহ্য হয়ে গেছে।

একসঙ্গে কয়েকটা বইয়ের প্রুফ দেখার সুযোগ পেলে নিজে কষ্ট করে থেকে দু-পাঁচটাকা মাঝে মাঝে হয়তো দিতেও পারবে সংসারে।

বাড়ি ফিরবে ঠিক করে নরেন ভাবে, কই খুশি হওয়া তো গেল না ? প্রাণের জ্বালা তো কমল না। ?

নিজের প্রাণকেই সে যেন বলে, খুশি হওয়া যায় কী ? তোমার জ্বালা কমে কি ? কোনোমতে ঠেকনা দিয়ে টিকে থাকা কী মানুষের জীবন যে খুশি হওয়া যাবে, জ্বালা জুড়োবে ?

তল্পিতল্পা গুটিয়ে নরেনকে বাড়ি ফিরতে দেখে সকলেই খুশি হয়।

এতদিন দেখা করতে এলে সকলে তার কাছে অপরাধী সেজে থেকে যে রকম আড়ষ্টভাবে কথাবার্তা বলত, বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে তার অনেকখানিই যেন উপে যায় !

এটাও হিসাব করেছিল নরেন। ভিন্ন রেঁধে খাক, একবাড়িতে একসঙ্গে বাস করার জন্যই সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসবে সকলের ব্যবহার।

তাকে রান্নার আয়োজন করতে দেখে ঊষা হাসিমুখে খুশির সঙ্গে বলে, উপোস ঠেকানোর ব্যবস্থা করে এসেছ জানি ! নইলে তুমি আসতে না।

তারপর বলে, আমি রেঁধে দিলে কোনো দোষ আছে ?

নরেন একটু ভেবে বলে, একটা কথা মেনে নিলে দোষ নেই।

কী কথা বলো।

ঘাসপাতা যা রাঁধতে দেব, মুখ বুজে রেঁধে দেবে। এই দিয়ে কী করে খাবে, এতটুকুতে কী করে পেট ভরবে, এ সব দরদের কথা মুখে আনতে পাবে না।

ঊষা স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাই হবে। ভেবেছ পারব না ? দেখে নিয়ো—আমি তোমারই বোন !

মাধবের সঙ্গে নরেনের দেখাসাক্ষাৎ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। বইটা উপলক্ষ করে নয়, মাধব তাকে আরেকটা কাজ দিয়েছে বলে।

মাধব তাকে একদিন বলে, বই ছাপাতে হেল্প করে মজুরি নিতে অপমান বোধ করেননি বলেই সাহস করে বলছি। পয়সা নিয়ে অন্যভাবে আমাকে একটু হেল্প করুন না ?

বলুন।

কতকগুলি কাজ আছে যাতে অনেক সময় চলে যায় অথচ আমি নিজে না করলেও চলে, অন্যে করে দিতে পারে। যেমন ধরুন, একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট নিয়ে একটা বইয়ে কোথায় কী বলা হয়েছে জানতে চাই, বইটা আমার পড়ার দরকার নেই। কিন্তু আমাকে বইটা আগাগোড়া ঘাঁটতে হয়। এ রকম আরও কতগুলি কাজ আছে, আপনি যা অনায়াসে করে দিতে পারেন। একটা কোটেশন চাই, কতকগুলি ফ্যাকস অ্যান্ড ফিগারস চাই—

মাধব থামতেই নরেন বলে, কাজ বুঝেছি—তারপর বলুন।

পুরো মাইনে দিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া দুদিন হয়তো এমন কাজ করব যে এ রকম হেল্প মোটেই দরকার হবে না। আপনি যদি সপ্তাহে তিন দিন কী চার দিন আসেন, দু-তিনঘণ্টা আমার এই কাজগুলি করে যান—

কিন্তু কী করে তা হবে ? আপনার এখুনি একটা কোটেশন দরকার, আমি হয়তো পরদিন আসব—আমার জন্য কাজ বন্ধ করে বসে থাকবেন ?

মাধব একটু হাসে।—এমন জড়ানো জটিল কাজ আমার, এতদিকে এত রকম পড়া আর চিন্তা করা দরকার যে একটা কোটেশনের জন্য সাতদিন অপেক্ষা করতে হলেও আমার আসবে যাবে না। ওদিকটা স্থগিত রেখে অন্যদিকের কাজ চালিয়ে যাব—সোজা কথা।

এবার বুঝেছি। তারপর বলুন।

মাধব বলে, আপনার এই কাজের দাম কীভাবে দেব, আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছে। অন্য কেউ হলে আলাদা কথা ছিল, আপনার আমার মধ্যে সে রকম সম্পর্ক নয়। বেকার বলে আপনাকে দয়া করা হবে না, আপনিও ভাবতে পারবেন না খাটিয়ে নিয়ে ঠকাচ্ছি।

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

একী সেই মাধব ? জ্ঞানের বিষয়ে ছাড়া, থিয়োরি নিয়ে ছাড়া যে সাধারণ ব্যাপারে ছেলেমানুষের মতো উলটোপালটা এলোমেলো কথা বলত ? সে আজ এমন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলছে, তার মান ও নিজের প্রয়োজন বাঁচিয়ে এমন সুন্দরভাবে প্রস্তাবটা পেশ করছে ?

মাধব একটা হাই তোলে। বেচারা শ্রান্ত বইকী—ক্লান্ত না হলেও। বসে বসে এমন একটানা মাথা খাটুনি—এদিকে ছেলেমেয়ের দায়—ওদিকে কেড়ে নেওয়া চাকরিটা উদ্ধারের জন্য লড়াই !

অনেকের সমর্থন পেয়েছে, অন্যায় বরখাস্ত বাতিলের লড়ায়ে মাধব খুব সম্ভব জিতে যাবে।

চাকরি হারিয়ে মানসীকে হারিয়ে কত হিসেবি হয়েছে মাধব, কত সজাগ হয়েছে তার বাস্তববোধ ! তার পরের কথাগুলি শুনে নরেন সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

মাধব বলে, ভেবেচিন্তে আমি একটা নিয়ম ঠিক করেছি। পছন্দ না হলে বলবেন কিন্তু। আপনি যতক্ষণ কাজ করবেন, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের বেতনের হিসাবে আপনার কাজের ঘণ্টা ধরে দাম দেব। আসা-যাওয়ার ফেয়ার দেব আর একটা টিফিন দেব।

বলেই মাধব সুর পালটে জোরের সঙ্গে বলে, আপনি এমনি এলেন, কাজ শেষ করে দুঘণ্টা গল্প করলেন তর্ক করলেন-- সেটা ধরব না কিন্তু। ওটা আমাদের বন্ধুত্বের হিসাব ! রাজি তো ?

রাজি বইকী !

নিয়মিত আসে যায়, বেতনভোগী সহকারীর মতো কাজও করে আবার বন্ধুর মতো তর্কও চালায় কিন্তু মাধব যেন একেবারে বদলে গেছে, একেবারেই যেন বদলে গেছে তাদের তর্কের ধারা।

অনেক রকম অনেক কথা মাধব বলে। মানসীর কথা কিছুই বলে না মাধব। একবার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে না।

শুভা চা দেয়, এটা-ওটা জোগায়, ছেলেমেয়েকে সামলায় আর রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ঘরে চলে যায়।

মাধবের গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় অনায়াসে নির্ভয়ে দরকারি কথা জিজ্ঞাসা করে।

মাধব খেঁকিয়ে ওঠে না ! বিরক্ত পর্যন্ত হয় না ! ধীর শান্তভাবে তার জিজ্ঞাসার জবাব দেয় !

মাধবের এ রকম মশগুল অবস্থায় জরুরি ব্যাপারেও মানসী তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেত না !

বিয়ে করা বউটার চেয়ে, ছেলেমেয়ের মা-টার চেয়ে, মাইনে করা রাঁধুনিকে সে বেশি সম্মান করে, রাঁধুনির সঙ্গেই তার ভালো বনে।

এ কথাটা মনে হবার জন্য দু-একদিনের মধ্যেই নরেন নিজের কাছে বড়ো লজ্জা পায়। সে প্রতিজ্ঞা করে জীবনে আর কোনোদিন কোনো মানুষ সম্পর্কে সাত-তাড়াতাড়ি এ রকম সস্তা সমালোচনা খাড়া করে নিজেকে ছোটো করবে না।

মানসীর কথা সে উল্লেখ পর্যন্ত করত না বলে নরেন ভাবত, শুধু শুভা নয়, এও মাধবের একটা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষণ।

মানসীকে একেবারে সে মুছে দিয়েছে মন থেকে।

তাই জরুরি কাজ ধামাচাপা দিয়ে মাধব সেদিন নিজে থেকে মানসীর কথা তুললে নরেন প্রথমে আশ্চর্য হয়ে যায়, তারপর মানুষটা সম্পর্কে নিজের অনুদার মনোভাবের জন্য নিজের কাছে লজ্জা বোধ করে।

মাধব বলে, মানসীর একটা চিঠি পেয়েছি নরেনবাবু। কী জবাব লিখব ভাবতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আমি এক রকম ভেবে এককথা লিখব, উনি আরেক রকম মানে করে আরও চটে যাবেন। আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক।

মাধব একটু হাসে।

এ কাজটা কিন্তু বন্ধু হিসাবে করবেন, দাম পাবেন না।

নরেন চমৎকৃত হয়ে যায়।

মানসীর চিঠি পেয়ে, চিঠির জবাব লেখার জন্য তার পরামর্শ দাবি করে, সহজভাবে হাসিমুখে এ রকম মার্জিত রসিকতাও মাধব করতে পারে এ অবস্থায় !

নরেন বলে, দাম পাব না মানে ? দাম তো আগাম পেয়ে গেলাম ! স্ত্রীর চিঠির জবাব লিখতে আমার পরামর্শ দামি ভাবছেন !

মাধব বলে, কী জানেন, এ সব সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। বড়ো বড়ো ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটাই, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা খাটানোর সময় কই ? কী দরকার মাথা খাটাবার ? মানসী তো শুধু ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে-পরে থাকার ব্যবস্থা চায়, সে ব্যবস্থা তো করেই দিয়েছি। আর কিছু ভাববার তো নেই আমার !

নরেন বলে, এ পর্যন্ত বুঝলাম। বউদি কী কী লিখেছেন না বললে এরপর যা বলবেন কিছুই বুঝতে পারব না।

টেবিলে বুক সেলফে তাকে আলমারিতে স্তূপাকার বই, টেবিলেও গাদাগাদি করা কাগজপত্র বই খাতা।

গেঞ্জির মতো ব্যবহার করার জন্য পাতলা কাপড় দিয়ে ঘরের কলে মানসীর সেলাই করা জামাটার বুক পকেট থেকে মানসীর চিঠিটা বার করে মাধব নরেনের হাতে দেয়।

তিন লাইন চিঠি।

স্বামীর কাছে একজন স্ত্রী ও মা-র চরম রকম গদ্য ভাষায় লেখা চিঠি। দু-পয়সার পোস্টকার্ডে লেখা !

প্রিয়তম,

আমি ভালো আছি। ছোটকু ভালো আছে। ইলা খোকনদের একটা দিনের জন্য পাঠাতে পার ? বড়োই মন কেমন করছে। একটা দিনের জন্য ওদের পাঠাতে পারলে ভালো হয়। ভালোবাসা নিয়ো।

ইতি তোমার মানসী।

চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে নরেন বলে, এ তো বউদির চিঠি নয়।

মানসীর হাতের লেখা।

হোক না বউদির হাতের লেখা। হাত কি লেখে ? মন যা হুকুম দেয় হাত তাই লিখে যায়।

মাধব গম্ভীব হয়ে বলে, জবাব দেবার আগে আপনাকে কনসাল্ট করে ভালোই হল। আমিও তাই ভাবছিলাম—মানসী হঠাৎ এ রকম নত হয়ে কী করে চিঠি লিখল। ভীষণ স্বার্থপর, নিজের স্বার্থেব হিসাবটা ঠিক বোঝে। কোনো ব্যাপারে কখনও কোনোদিন রাগারাগি না করে ধমক না দিয়ে নত করাতে পারিনি ! নিজে থেকে নত হয়ে ও এ রকম চিঠি লিখল ? আপনি না বললে আমি ধরতেই পাবতাম না এ চিঠির মানে।

আপনাকে কিন্তু এবার একটু নত হতে হবে।

কেন ? আপনিই বলছেন এ চিঠি মানসী স্বেচ্ছায় নত হযে লেখেনি। আমি নত হতে যাব কেন ?

বউদি স্বার্থপর হলেও তিনি আপনার স্ত্রী বলে আপনার ছেলেমেয়ের মা বলে নত হবেন। এমনিতেই তো মেয়েরা সব বিষয়ে নত হয়ে আছে—মান-অভিমানের ছেলেখেলায় পুরুষকে একটু নত করতে চাইলে সেটা মানতে হয়।

মাধব গম্ভীব হয়ে দেয়ালে টাঙানো বড়ো ঘড়িটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে।

অবিবাম টকটক শব্দ করে ঘড়িটা সময় মেপে চলেছে।

হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হয়ে মাধব বলে, আপনি যাবেন, না আমি যাব ?

এর মানে ?

আমি গেলে হয়তো না বুঝে সামান্য এটা-ওটা নিয়ে রাগারাগি করে সব ভেস্তে দেব। আপনি গেলে আমার দিকটা একটু বুঝিযে বলতে পাববেন, বুঝে-শুনে কথা কইতে পাববেন।

বেশ তো, আমিই যাব।

তিনতলা বাড়ি।

গেটে দাবোয়ান।

নবেন এ সব ব্যাপার জানে।

দরোযানকে তোষামোদ করে অন্দরে শ্লিপ পাঠিয়ে আধঘণ্টা নত হয়ে বসে থাকার বদলে সে সোজাসুজি গটগট করে ভিতরে চলে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে নামছিল মানসীর দিদি অতসী।

তাকে দেখেই নরেনের মনে হয় এত ওজনের গয়নার ভার বয়ে সে কী করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা চলাফেরা কবে !

কে ?

আমি মাধববাবুর ছোটোভাই। বউদির কাছে এসেছিলাম।

মোটা অতসীর ফরসা ফাঁপা গালে টোল খেয়ে খুশিতে ফেটে পড়া হাসি ফোটে।

তেতলায় ডান দিকের ঘরে মানসী শুয়ে আছে।

নরেনকে দেখেই মানসী বলে, আমি জানতাম নিজে আসবে না, আপনাকে পাঠাবে।

বিছানা থেকে সে মাথা পর্যন্ত তোলে না। এপাশ ওপাশ ফেবে না। ভদ্রতা করে নরেনকে বসতে পর্যন্ত বলে না।

নরেনও ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করে, অসুখটা কী বউদি ?

নার্ভের অসুখ। অতিরিক্ত চাপ সইতে সইতে বিগড়ে গেছে।

তাহলে ভয় নেই। ঠিক হয়ে যাবে।

চাপ সইতে হলেও ?

চাপ নয়—এবার বিশ্রামের ব্যবস্থা। বলছিলেন যে আপনি জানতেন মাধববাবু নিজে আসবেন না, আমাকে পাঠাবেন। নিজে না এসে আমায় কেন পাঠালেন জানেন কী ?

জানি বইকী। নিজে এলে অপমান হত।

নরেন হেসে মাথা নাড়ে।—হল না। মাধববাবু আপনাকে ভয় করেন, নিজে আসতে সাহস পেলেন না।

তামাশা করছেন ? না ছেলে ভুলোচ্ছেন ?

সত্য কথা বলছি। কী বলতে কী বলে বসবেন, এক ভেবে কথা বললে অন্য মানে বুঝে আপনি হয়তো চটে যাবেন—এই ভয়ে প্রথমে আমাকে পাঠালেন।

মানসী নীরবে চেয়ে থাকে।

নরেন সহজভাবে বলে, ছেলেমেয়ে নিয়ে উনি কাল আসবেন—নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

কী সুন্দর সকাল বৈশাখের !

কী আনন্দময় পশুপাখির জীবন।

জীবন যেন নিজের মধ্যে নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে চারিদিকে কলরব করে উঠে নিজেকে ঘোষণা করছে আকাশে সূর্যের প্রথম আলোর ছোঁয়াচ লাগার আগেই।

অর্ধেক রাত কেটেছে ছটফট করে। বড়ো কষ্টের রাত। হতাশায় বেদনায় ব্যর্থতায় বিষাক্ত কবা রাত।

ভোর হবার আগেই নরেন আটকানো দম ছাড়তে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, ছড়ানো ইটের কোটরের মধ্যে হাত-পাঁচেক চওড়া পথটার মুক্ত আকাশটুকুর নীচে, খোলা বাতাসে।

কতটুকু আকাশ আর দেখা যায়। কতটুকু বাতাস গায়ে লাগে। কটা আর পশুপাখি গাছের ডালপালা নজরে পড়ে। তবু অনুভব করা যায় চারিদিকে যেন অস্থির চঞ্চল জীবনের স্পন্দন।

বিড়ি সিগারেট কিছুই নেই। তারিণীর হুঁকো কলকেতে তামাক সেজে নিয়ে বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে তামাক খেতে খেতে জীবনপথের প্রবীণ স্থবির পথিকের মতো নরেন চারিদিকে তাকায় আর নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন ?

জীবন এত দুঃখ কষ্ট ব্যর্থতা হতাশা নিয়েও প্রাণে তার এত আনন্দ কেন ? লাথিঝাঁটা খাওয়া থেঁতলে দেওয়া প্রাণটাতে নিরুপায় হতাশার মেঘ সবটুকুই ঘনিয়ে আছে, সূর্য উঠলে পেটের খিদে মিটোতে এক টুকরো রুটি আজ জুটবে কিনা সন্দেহ আছে। তবু কেন গান গেয়ে উঠতে সাধ যায় ?

অ্যালুমিনিয়ামের একটা কৌটা হাতে নিয়ে হাফপ্যান্ট শার্ট-পরা নিকুঞ্জ গটগট করে হেঁটে আসে, জীবন আর জগতের সেই যেন রাজা !

এত ভোরে ?

দূর তো কম নয় ? আদ্ধেক রাস্তা যেতে যেতেই শ্যামের বাঁশি কলের ভোঁ শুনব।

চারিদিকে ফরসা হয়ে আসে।

তামাকটুকু শেষ হয়ে এসেছে। আরেক কলকে যে সেজে আনবে তার উপায় নেই। এক কলকে তামাকই বোধ হয় আছে—ওটুকু শেষ করলে তারিণী ঘুম থেকে উঠে তামাক না পেয়ে খেপে যাবে।

পাড়ার তিন বাড়ির তিনজন ঠিকা ঝি একে একে সামনে দিয়ে চলে যায়। ভুবনবাবুর বাড়ি কাজ করে থুরথুরে বুড়ি নেপার মা। নেপা কবে স্বর্গে চলে গেছে, নেপার মা আজও লোল চামড়া কঙ্কালসার দেহ নিয়ে বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে জীবিকা অর্জন করে বেঁচে আছে।

ধীরে ধীরে কাজ করে। প্রতিদিন অন্তত দশবার ভুবনের স্ত্রী তাকে দূর দূর করে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে !

নেপার মা কোনো কথা কানে না তুলে নিঃশব্দে কাজ করে যায়।

ভুবন আপশোশ করে পাড়াব লোককে বলে, কী ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই বলব কী। মাগি খাটতে পারে না, একটা থালা মাজতে আধঘণ্টা লাগিয়ে দেয়, তবু ওটাকেই মাইনে দিয়ে রাখতে হয়েছে। তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। দশ-বারোবছর কাজ করছে—

কে যেন বলেছিল, আপনার কিন্তু এবার নেপার মাকে না খাটিয়ে পেনশন দেওয়া উচিত।

ছবিরাণীও কী একদিন এ রকম থুরথুরে বুড়ি হয়ে যাবে চাকরে স্বামীর সংসার করতে করতে ? সতেরোই বৈশাখ বিয়ে হবে ছবিরাণীর। দিন সাতেক বাকি আছে। ছবিরাণীর কথা ভাবছিল বলেই ছবিরাণী একেবারে সামনে এসে দাঁড়ানোব আগে নরেন তাকে দেখতেই পায়নি।

ছবিরাণী বলে, বাঁচলাম বাবা। এত ভোরে তোমার ঘুম ভাঙে ?

ঘুম ভাঙে মানে ? ঘুম হয় না, ভাঙবে কী ! তুমি এত ভোরে ?

রাতেই হয়তো এসে পড়তাম। তোমায় ডেকে তুলতে হইচই হাঙ্গামা হবে এই ভয়ে কোনোরকমে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি।

ব্যাপারটা কী ?

বুঝতে পারছ না ? এত ভোবে পাগলের মতো ছুটে এসেছি, তবু জিজ্ঞেস করতে হয় ব্যাপার কী ? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম—যদি তুমি যাও, যদি আমার মান বাখ। মান খুইয়ে এলাম তবু বুঝতে পারছ না ব্যাপাব কী ?

নবেন হুঁকোয টান দিয়ে পোড়া তামাক থেকে ধোঁয়া বার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, বুঝেছি বইকী। মন ঠিক করেছিলে, মনটাকে আবাব বেঠিক করেছ।

সবু বোয়াকে তার পাশে বসে ছবিরাণী হেসে বলে, জানো, ক-দিন শুধু কেঁদে কাটিয়েছি। আমি কখনও কাঁদি না জানো তো ? ক-দিন খালি কান্না আসে, যত চাপতে চাই, যত ভাবি কিছুতে কাঁদব না, তত যেন আরও বেশি করে কান্না আসে। ভেবে পাই না কেন, কী ব্যাপাব। তোমার জন্য নয়, অথচ কান্না পাচ্ছে। কাল বুঝলাম, হিসেবটাতে নিশ্চয় ভুল হয়েছে। একেবারে উলটো হয়ে গেছে হিসাব।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ গো। তোমার চাকরি বাকরি নেই বলে কোথায় আরও বেশি করে তোমায় আঁকড়ে ধরব, তোমার হয়ে সবার সাথে লড়াই কবব, তার বদলে তোমায় বাতিল করে দিলাম ! একেবারে উলটো হিসাব নয় ? কী বোকাই ছিলাম আমি !

নরেন তার বাঁ হাতটি মুঠো কবে ধরে বলে, এভাবে এসেই হয়তো বেশি রকম বোকামি করছ !

ছবিরাণী সমস্ত চোখ-মুখ দিয়ে হাসে।

না। আমি এবার ঠিক বুঝেছি। কাল কী ভাবলাম জানো ? ভাবলাম তোমার চাকরিটা থাকতে থাকতে যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যেত ? চাকরি গেছে বলে তোমায় তখন কি ছাঁটাই করতে পারতাম ? ভেবেই ঠিক করলাম, মান চুলোয় যাক, ভোরে উঠে আমি নিজেই তোমার কাছে আসব।

নাগপাশ উপন্যাসের খসড়া